সাহিত্যিক

মাওলানা আহমাদ আলী

শেখ আখতার হোসেন

أديب مولانا أحمد علي

تأليف: الشيخ أختر حسين

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৩৬

ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

১ম প্রকাশ

হোসেন প্রকাশনী

দৌলতপুর, খুলনা।

১৯৮৬ ইং

২য় সংস্করণ

হা.ফা.বা.

১৪১৮ বাং/১৪৩৩ হিঃ/২০১১ ইং

ISBN : 978-984-33-4797-8

কম্পোজ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

নির্ধারিত মূল্য

আঠার (১৮) টাকা মাত্র।

Shahittik Moulana Ahmad Ali by **Sheikh Akhtar Hossain**. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365.

بسم الله الرحمن الرحيم

✍ লেখকের কথা ✍

মাওলানা আহমাদ আলী ছিলেন একজন সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও সুবক্তা। আদর্শ শিক্ষক হিসাবেও তিনি সুনাম অর্জন করেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল মানবসেবা। সারাজীবন তিনি খুলনা ও যশোর যেলার সর্বসাধারণের শিক্ষার উন্নতির জন্য মাদরাসা, মসজিদ, স্কুল, পাঠাগার ইত্যাদি গড়ার কাজে অতিবাহিত করেছেন।

ইসলামের বিভিন্ন বিভাগের উপর তাঁর লেখা বই সমূহ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মোট ষোল খানা বই লিখেছেন। কোলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এক সময় তিনি লিখতেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের।

সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে মাওলানা আহমাদ আলী যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে থাকবেন।

শেখ আখতার হোসেন
১/২/১৯৮৬ ইং

হোসেন বেকারী
খান এ, সবুর রোড
দৌলতপুর, খুলনা।

সূচীপত্র

(المحتويات)

মাওলানা আহমাদ আলী

জন্ম : ১২৯০ সাল, মোতাবেক ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

মৃত্যু : ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ সাল

১৯শে জুমাদাল ঊলা ১৩৯৬ হিজরী

১৯শে মে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ, বুধবার দিবাগত রাত ৯-২০ মিঃ।

বয়ঃকাল : ৯৪ বৎসর।

❑ জন্মস্থান :

খুলনা বিভাগের অন্তর্গত বর্তমান সাতক্ষীরা যেলা শহর হ'তে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ৭নং আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বুলারাটি গ্রামের 'মণ্ডল' বংশে সম্মানিত আলেম পরিবারে 'মৌলবী বাড়ী'-তে বাংলা ১২৯০ সালে মাওলানা আহমাদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুনশী যীনাতুল্লাহ একজন বুযর্গ ব্যক্তি ও গ্রামের সরদার ছিলেন। মাতা জগৎ বিবি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা, দানশীলা ও পুণ্যবতী মহিলা।

❑ বংশধারা :

আরবদেশ থেকে আগত মাওলানা সৈয়দ শাহ নাযীর আলী আল-মাগরেবী (রহঃ) থেকে এই বংশের সূত্রপাত হয়েছে। আল্লাহ্র ঐকান্তিক রহমতে এই বংশ শুরু থেকেই 'আহলেহাদীছ' ছিল এবং এই বংশে চিরদিন প্রতি স্তরে অন্ততঃ একজন করে যোগ্য আলেম ছিলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ, মাওলানা সিরাজুল ঈমান, মাওলানা আব্দুর রহমান প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছিলেন এই বংশেরই কৃতী সন্তান। মাওলানা আহমাদ আলী ছিলেন তাঁদেরই যোগ্য উত্তরসূরী। নিম্নে তাঁর বংশধারা প্রদত্ত হ'ল।-

১। মাওলানা সৈয়দ শাহ নযীর আলী আল-মাগরেবী

২। উযীর আলী

৩। আবদুল হালীম

৪। রফী মাহমূদ

৫। আলহাজ্জ যমীরুদ্দীন

৬। মুনশী যীনাতুল্লাহ

৭। মাওলানা আহমাদ আলী (রাহেমাহুমুল্লাহ)।

ঊর্ধ্বতন ৬ষ্ঠ পিতৃপুরুষ মাওলানা সৈয়দ শাহ নযীর আলী আল-মাগরেবী একজন যবরদস্ত আলেম ছিলেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'আল-মাগরিব' অর্থাৎ মরক্কো বা আরব দেশ হ'তে এদেশে আগমন করেন। তাঁর উন্নত চরিত্র মাধুর্যে ও হাদীছ ভিত্তিক তাবলীগে মুগ্ধ হ'য়ে পশ্চিম বঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা যেলাধীন বারাসাত মহকুমার 'ফল্‌তী' এলাকার লোকেরা 'আহলেহাদীছ' হ'য়ে যান। তিনি উক্ত গ্রামের নামযাদা কুলীন বংশ 'মণ্ডল পরিবারে' মণ্ডলের (সর্দারের) কন্যার পাণি গ্রহণ করেন এবং এদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বলা বাহুল্য, তখন থেকে তাঁর বংশ 'সৈয়দ বংশের' বদলে স্ত্রী সূত্রে 'মণ্ডল বংশ' নামেই খ্যাতি লাভ করে।[১]

জমিদার রফী মাহমূদ :

মাওলানা সৈয়দ শাহ নযীর আলীর চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ রফী মাহমূদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে বর্তমান সাতক্ষীরার আলীপুর অঞ্চলে আগমন করেন। এলাকায় তখন পুষ্পকাটির হিন্দু জমিদারদের শাসন-শোষণ চলছিল। তারা পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজকে হেয় জ্ঞান করত ও তাদের প্রতি যদৃচ্ছ আচরণ করত। তিনি এখানে এসে মুসলমানদের অধিকার সচেতন করে তোলেন এবং শোষিত মুসলিম ও হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন। এভাবে তিনি পুষ্পকাটির জমিদারদের বিরুদ্ধে নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর সম্ভাব্য হামলা ঠেকানোর জন্য সুন্দরবন নিকটবর্তী এলাকার ছিন্নমূল মুসলমানদের এনে বর্তমান বুলারাটি ও তার পার্শ্ববর্তী নিজ জমিদারী এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। লোকেরা জমি-জমার খাজনা তাঁকেই দিত। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর জমিদারী উচ্ছেদের ফলে এরা বর্তমানে স্ব স্ব দখলী জমির স্থায়ী মালিকানা লাভ করেছে।

বুলারাটি ও মাহমূদপুর নামকরণ : তখন এলাকা নিম্নভূমি ছিল এবং এখানে 'বুলা' নামক দেড়-দু'হাত লম্বা বাঁশ জাতীয় একপ্রকার ডাল-পালাহীন গুল্ম জন্মাতো। যা শুকিয়ে আটি করে খড়ি হিসাবে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত এলাকার সাধারণ লোকেরা। তখন থেকে এই গ্রামটি বুলারআটি বা 'বুলারাটি' নামে পরিচিত হয়। অত্রাঞ্চলের লোকেরা রফী মাহমূদকে 'জমিদার' হিসাবে গ্রহণ করলেও তিনি বা তাঁর পরবর্তীগণ কখনোই নিজেদেরকে 'জমিদার' হিসাবে বলতেন না। এলাকার সকল শালিশ-বিচার তিনিই করতেন। ইংরেজ আদালতে কোন মামলা যেতনা। তাঁর সুবিচারের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে দূর-দারায থেকে বহু মানুষ এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। রফী মাহমূদের

১. সূত্র : মৌলভী আবদুর রশীদ নূরী (মাওলানার ভাতিজা)। তাং ১১/৭/১৯৭৬ খৃঃ।

নামানুসারে বর্তমান ‘মাহমূদপুর’ গ্রামটি আজও তাঁর প্রতি এলাকার মানুষের অগাধ ভক্তির স্মৃতি বহন করছে। বংশ পরম্পরায় বিচার-শালিশের এ সিলসিলা জারি ছিল। এমনকি ৬ষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ মুনশী যীনাতুল্লাহ ২২ গ্রামের সর্দার বলে পরিচিত ছিলেন এবং ইনিই ছিলেন মাওলানা আহমাদ আলীর বুযর্গ পিতা। ইসলামী শরী‘আতের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার কারণে এই বংশ স্থানীয়ভাবে ‘শরাওয়ালা’ বংশ, মৌলভী বংশ বা মণ্ডল বংশ হিসাবে পরিচিত ছিল। মাওলানা আহমাদ আলীর বাড়ী ‘মৌলবী বাড়ী’ হিসাবে আজও পরিচিত। আল্লাহ্র রহমতে এই বংশের চিরকালীন উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র উৎস ছিল একনিষ্ঠভাবে শরী‘আতের অনুশাসন প্রতিপালন। যদিও যুগের হাওয়ায় বর্তমানে তা অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে।

মুনশী যীনাতুল্লাহ্র আমলে গ্রামের সামাজিক শাসন কেমন ছিল, এ বিষয়ে মাওলানা আহমাদ আলী বলতেন, আব্বাজান প্রায়ই নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঘুরতে যেতেন। যেখানেই ইসলাম বিরোধী কিছু দেখতেন, ঠিক করে দিতেন। কলাগাছের শুকনা পাতা, যাকে গ্রামের ভাষায় ‘বাস্না’ বলা হ’ত, তাই দিয়ে বাড়ীর চারপাশে ঘিরে পর্দা করতে বলতেন। তিনি আসছেন, জানতে পারলে গ্রামের সবাই হুঁশিয়ার হয়ে যেত। হাটবারের দিন মসজিদের পাশের রাস্তা দিয়ে যারা হাটে যেত, তাদের জিজ্ঞেস করতেন, ‘আছর’ পড়েছে কি-না। নইলে মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য বাধ্য করতেন। মসজিদে বা মসজিদের সামনে কদবেল তলার ‘ধরাতে’ বসা মুরব্বীদের সালাম করে সবাই রাস্তা অতিক্রম করত। মসজিদে কোন আলেম বা মুসাফির এলে তিনিই খাওয়াতেন ও মেহমানদারী করতেন। তাদের জন্য আলাদা লেপ-তোষক, কাঁথা-বালিশ প্রস্তুত থাকত। মেহমান বেশী হ’লে প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। মেহমানদের জন্য মসজিদে খাবার আনতে হ’ত। মেহমান কারু বাড়ীতে যাওয়াটা অসম্মানজনক মনে করা হ’ত। কেননা তিনি আল্লাহ্র মেহমান। তাকে মর্যাদা দেওয়া সবার জন্য কর্তব্য। মসজিদের সাপ্তাহিক কৌটা আদায়ের পয়সায় হাত দেওয়াকে জাহান্নামের আগুনে হাত দেওয়া বলে মনে করা হ’ত। এমনকি সেগুলি দিয়ে বড় টাকা বানানোও নিষিদ্ধ ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, তিনি তাঁর মাকে একই নিয়ম অনুসরণ করতে দেখেছেন।

মুনশী যীনাতুল্লাহ্র সময়ে তাঁর প্রভাবিত সকল গ্রামে ফিৎরা, কুরবানী, ওশর-যাকাত মুতাওয়াল্লীর নিকট মসজিদে জমা হ’ত। তিনি একটি ছোট কমিটির পরামর্শ মতে সারা বছর তা থেকে গ্রামের দুস্থদের বিপদাপদে সাহায্য করতেন। ধনী-গরীব সবার কাছ থেকে ফিৎরা আদায় করতেন। পরে গরীবদের দ্বিগুণ ফেরৎ দিতেন। কুরবানীর গোশত তিনভাগের একভাগ মসজিদের পাশে মক্তবের

সামনে জমা নিতেন। অতঃপর যারা কুরবানী করতে পারেনি, তাদের তালিকা করে তাদের বাড়ীতে মাথা হিসাব করে গোশত পোঁছে দিতেন। এ ব্যবস্থা আজও চালু আছে। গ্রামের বিবাহ-শাদীতে সবাই মুতাওয়াল্লীর অনুমোদন ও দো'আ নিত। বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীন ও বংশ মর্যাদাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। গরীবদের বিয়েতে পাড়ার সবাই সাহায্য করত। কেউ চাষাবাদ বা ধান কাটায় অক্ষম হ'লে পাড়ার যুবকরা স্বেচ্ছাশ্রমে তাকে সাহায্য করত। একে 'বেগার দেওয়া' বলা হ'ত। এভাবে গ্রামে পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভালোবাসার পরিবেশ বজায় রাখা হ'ত। গ্রামে কেউ মারা গেলে তার প্রতিবেশীরা ঐ বাড়ীর সবাইকে তিন দিন খাওয়াতো। আত্মীয়-স্বজন ও লোকসংখ্যা বেশী হ'লে পাড়ার সবাই মিলে তাদের খাওয়াতো। এ সুন্নাতী রেওয়াজ এখনো অন্তত: একদিন চালু আছে। এছাড়া রামাযান মাসে সবাইকে মসজিদে ইফতার পাঠানো এবং রোযাদারদের বাড়ীতে দাওয়াত করে ভাত খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল।

আলহাজ্জ যমীরুদ্দীন :

রফী মাহমূদের ইন্তেকালের পর তদীয় পুত্র আলহাজ্জ যমীরুদ্দীন পিতার সুনাম আরো বৃদ্ধি করেন। জমিদারী রক্ষা ছাড়াও নিকটবর্তী সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ সড়কের পূর্ব পার্শ্বে জংগল ছাফ করে পথিক জনসাধারণের সুবিধার্থে তিনি সেখানে বিরাট পুষ্করিণী খনন করেন ও তার চারপাশে বিরাট এলাকা ব্যাপী আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ফলদ বৃক্ষরাজির সুশোভিত বাগান রচনা করেন। কিন্তু পাকিস্তান আমলে আইয়ূব সরকারের সময় (১৯৫৮-১৯৬৯ খৃঃ) খুলনা-কালিগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণকালে রাস্তা সোজা করার অজুহাতে বাগানের পশ্চিমাংশ নিশ্চিহ্ন করা হ'লে বাকী অংশগুলো থেকে বাগান ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে বর্তমানে সেগুলো ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। তিনি পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে পাকা ঘাট, পাকা ছালাতগাহ ও হাটখোলা প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও আছে। তবে সংস্কারের অভাবে ঘাটটি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি গ্রামের জুম'আ মসজিদ সংস্কার করেন এবং তার সাথে একটি নিয়মিত ফুরকানিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা আজও চালু আছে। মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্রের মাধ্যমে কুয়েতী দাতাসংস্থার অর্থায়নে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি ভেঙ্গে নতুনভাবে দোতলা করা হয়েছে এবং পুরুষ ও মহিলা সকল মুছল্লীর জন্য নীচতলায় ও দোতলায় পৃথক ভাবে ছালাত ও ওযূখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❑ বংশ চেতনা :

একদিন সকাল ১০-টার দিকে পুষ্পকাটির জমিদার তার সাথী-সঙ্গী নিয়ে বুলারাটি আসেন। তখন উভয় জমিদারের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল। তিনি

বুলারাটি এসে স্বভাব সূলভ ভঙ্গিতে জনাব আফতাব মণ্ডলের নাম ধরে ডেকে তিনি বাড়ী আছেন কি-না খোঁজ নেন। ঐ সময় পুরুষ লোক কেউ বাড়ীতে ছিলেন না ছিয়ামুদ্দীন মণ্ডল ব্যতীত। জমিদারের লোক এসেছে শুনে তিনি বাইরে এলেন এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, জমিদার! মণ্ডল বংশের কোন ব্যক্তির নাম ধরে ডাকার সাহস তুমি কোথায় পেলে? জমিদার অবস্থা বেগতিক দেখে দ্রুত নৌকায় উঠে পালাতে থাকে। তখন ছিয়ামুদ্দীন মণ্ডল একাই হাতে একটা লাঠি নিয়ে আরেকটি নৌকায় করে জমিদারের পিছু নেন। এইভাবে তাকে ও তার বাহিনীকে তাড়িয়ে পুষ্পকাটি পার করে দেন।

শিশু আহমাদ আলী

মৌলবীবাড়ীতে ২টি বৈঠকখানা ছিল, যাকে 'দলুজ' (দহলিজ) বলা হ'ত। একটি বংশের সাধারণ মেহমানখানা হিসাবে, অন্যটি বিচারালায় হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। সেখানে বিচারক চেয়ারে, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বেঞ্চে এবং অন্যেরা পিড়িতে অথবা চাটাইতে বসতেন। একদিন পিতা মুনশী যীনাতুল্লাহ একটি শালিশী বৈঠক করছেন। এমন সময় শিশু আহমাদ আলী সেখানে গিয়ে হাযির। সবাই তাকে বেঞ্চে বসানোর জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি কোথাও না বসে সোজা চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তখন বাড়ীর ভিতর থেকে একটা চেয়ার এনে দিলে তিনি খুশী মনে তাতে বসে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে সকলে মন্তব্য করেন যে, এ শিশু একদিন সমাজের নেতা হবে।

❑ শিক্ষাজীবন :

পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রেই তিনি বাড়ীতে পবিত্র কুরআন, উর্দূ, ফারসী ও বাংলা শিক্ষা করেন। গোবরদাড়ীর হাফেয মাওলানা আব্দুর রহমানের নিকটেও তিনি কিছুদিন পড়াশুনা করেন। শেষ সন্তান হওয়ার কারণে বৃদ্ধা মা তাঁকে দূরে কোন শহরে গিয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ দিতে চাননি। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

❑ জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা :

অল্প বয়সেই চারিদিক থেকে বিয়ের পয়গাম আসতে শুরু করে। একবার এক কন্যাপক্ষ ছেলে যথেষ্ট শিক্ষিত নয় বলে কানাঘুষা করলে পিতা মুনশী যীনাতুল্লাহ বাড়ীর ভিতরে এসে ছেলের মাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। ১৭ বৎসরের তরুণ আহমাদ আলী আড়াল থেকে এসব কথা শুনে তখুনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন এবং মাত্র এক টাকা সাড়ে বারো আনা পকেটে নিয়ে সেই রাতেই গোপনে কলিকাতায়

পাড়ি জমান। অতঃপর দীর্ঘ একযুগ পরে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ফাযেল (উলা) ক্লাসের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে কিছুদিনের জন্য বাড়ী ফিরে আসেন।

বলা বাহুল্য, ঐ রাতের ঐ ছোট্ট ঘটনাটিই তরুণ আহমাদ আলীকে ভবিষ্যতে 'মাওলানা আহমাদ আলী' হয়ে সমাজের দিশারী হওয়ার প্রতি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ :

১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতার উদ্দেশ্যে রাতের অন্ধকারে বাড়ী ছাড়লেও তরুণ আহমাদ আলী আত্মীয়-স্বজনের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে কলিকাতায় অবস্থান না করে সোজা আযমগড় (উত্তর প্রদেশ) চলে যান। সেখানকার খ্যাতনামা আহলেহাদীছ মাদরাসায় তিন বছর লেখাপড়া করার পর তিনি কলিকাতা সরকারী আলিয়া মাদরাসায় এসে 'দাখেলী সুওমে' (প্রবেশিকা ৩য় বর্ষ) ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষতঃ আরবী ব্যাকরণে তিনি একজন কৃতী ছাত্ররূপে বরিত হন। কয়েক বৎসর পরে 'আলেম' ফাইনাল পরীক্ষায় বাঙ্গালী (পূর্ব বাংলা) ছাত্র হয়েও তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মাত্র তিনটি নম্বরের জন্য তিনি স্কলারশিপ লাভে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ফাযেল বা 'উলা' পাশ করেন। এই সময় তিনি বিপ্লবী আলেম মাওলানা আকরম খাঁর সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর কলিকাতা আলিয়ার সর্বোচ্চ ডিগ্রি 'কামেল' (টাইটেল) টেষ্ট পরীক্ষায় সুনামের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে মাতৃবিয়োগের সংবাদে ফাইনাল পরীক্ষার মাত্র ১৪ দিন পূর্বে দেশে ফিরে আসেন। ফলে কামেলের সার্টিফিকেট লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। প্রকাশ থাকে যে, সে সময় 'কামেল' তিন বৎসরের কোর্স ছিল।

বেশ কিছুদিন বাড়ীতে কাটানোর পর তিনি পুনরায় কলিকাতা ফিরে যান এবং বিহারের 'দারুলউলূম আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ' মাদরাসার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুন নূর দারভাঙ্গাবীর নিকট তিন বৎসর 'কুতুবে সিত্তাহ' অধ্যয়ন করেন ও তাঁর হাতেই দিস্তারবন্দী সম্পন্ন হয়।

❑ মেধা এবং শিক্ষণীয় কিছু ঘটনা :

মেধাবী ছাত্র হিসাবে ছাত্র-শিক্ষক সকলের নিকট তিনি অত্যন্ত সুনাম কুড়িয়েছিলেন। বিশেষ করে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। কলিকাতা আলিয়ার তৎকালীন সেরা ছাত্র আব্দুল মান্নান তাঁর নিকটে নিয়মিত আরবী ব্যাকরণ পড়তেন। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, আব্দুল মান্নান ছিল তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন এবং দ্রুত পড়া মুখস্ত হয়ে যেত। কিন্তু ব্যাকরণ

বুঝত না তেমন কিছু। পক্ষান্তরে আহমাদ আলী অতটা তীক্ষ্ণধী ছিলেন না। কিন্তু ব্যাকরণ বুঝতেন সুন্দরভাবে।

বই বা হারিকেন কেনার সামর্থ্য ছিল না বলে তিনি বন্ধুদের নিকট থেকে বই ধার নিয়ে এশার ছালাতের পরে রাস্তার পার্শ্বে লণ্ঠন বাতির নীচে দাঁড়িয়ে দৈনন্দিন পড়া তৈরী করতেন।[২] কালি-কলম ছিল না বলে কাঠ পেন্সিল দিয়ে লিখতেন।

তাঁর মধুর কণ্ঠের আযান শুনে পাশের মহল্লা হ'তে তাঁকে লজিং রাখার জন্য উস্তাদ আইয়ূব বিহারীর নিকট প্রস্তাব আসতে থাকে। সকলের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে অবশেষে উস্তাদের হুকুমে তাঁকে মাসে তের বাড়ী লজিং নিতে হয়। অধিকাংশই ছিল কুলি-মজুর শ্রেণীর কর্মজীবি মানুষ। সিকি ইঞ্চি পুরু যবের রুটি ও মহিষের গোশত অথবা যবের ছাতু ছিল তাঁর প্রায় নিত্য দিনের খাদ্য। কিন্তু তিনি ছিলেন সকলের চোখের পুত্তলী। তিনি খেতেন আর জায়গীরদার বা তার ছেলে তাঁকে বাতাস করতেন। উস্তাদ আইয়ূব বিহারী ঠাট্টা করে তাঁকে প্রায়ই বলতেন, *'হামলোগ খানা খাতে হ্যায়, আওর আহমাদ আলী হাওয়া খাতা হ্যায়'* (আমরা খাদ্য খাই, আর আহমাদ আলী হাওয়া খায়)। মুরব্বীরা তাঁকে আদর করে দৈনিক বিকালে দামী কুলফী বরফ খাওয়াতেন। তিনি বলতেন, সম্ভবতঃ একারণেই তিনি মাত্র ৫২ বছর বয়সে সব দাঁত হারান।

❑ কর্ম জীবন (বাংলা ১৩২৩-১৩৮৩) :

দীর্ঘ ১৭ বছরের শিক্ষা জীবন শেষে বিশিষ্ট আলেম ও বাগ্মীরূপে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলা ১৩২৩ সালে (১৯১৬ খৃঃ) কর্ম জীবনের শুভ সূচনায় তিনি বাংগালী মুসলমানের গৌরব, মুসলিম সাংবাদিকতার জনক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রসেনা মাওলানা আকরম খাঁর (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃঃ) ব্যক্তিগত আবেদনে তদীয় গ্রাম উত্তর ২৪ পরগনার হাকিমপুর জামে মসজিদের ইমামতি ও এতদঞ্চলের অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হাকিমপুরে চার বছর কাটানোর পর তিনি বর্তমান সাতক্ষীরা সদর উপযেলার অন্ত র্গত লাবসার জমিদার ইমাদুল হকের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে তদপরিচালিত অত্রাঞ্চলের তৎকালীন একমাত্র ইসলামী শিক্ষায়তন লাবসা মাদরাসায় মাসিক মাত্র ১৫.০০ (পনের টাকা) বেতনে সেকেণ্ড মৌলবী পদে নিয়মিত শিক্ষকতা শুরু করেন।

---

২. উপমহাদেশে প্রথম কলিকাতায় বৈদ্যুতিক বাল্ব আসে ইংরেজী ১৮৯৯ সালে এবং পরে বাঙ্গালোরে আসে ১৯০৬ সালে। *-প্রকাশক।*

প্রথম কিস্তিতে লাবসায় দশ বছর অবস্থানের পর তিনি যশোর যেলার কেশবপুর উপযেলাধীন দোরমুটিয়া গ্রামে মাদরাসা কায়েম করেন। যা পরে নিউস্কীম মাদরাসা হিসাবে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। এখানে ছয় বৎসর অবস্থানকালে মাদরাসার সেক্রেটারী মুনশী খলীলুর রহমান তাঁর জায়গীরদার ছিলেন।

দোরমুটিয়ার পরে তিনি এক বছরের জন্য ২৪ পরগনার প্রখ্যাত আলেম বাংলায় পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজীদের প্রথম অনুবাদক মাওলানা আব্বাস আলীর (১৮৫৯-১৯৩২ খৃঃ) স্বগ্রাম চণ্ডিপুর মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর সেখান থেকে পুনরায় পূর্বের কর্মস্থল লাবসায় ফিরে আসেন এবং দুই কিস্তিতে মোট সাতাশ বছর সেখানে অতিবাহিত করেন। লাবসায় দীর্ঘদিন অবস্থানকালে তাঁর জায়গীরদার ছিলেন জনাব আনোয়ার শেখ।

লাবসার পরে তিনি পাথরঘাটা জামে মসজিদে ইমামতি ও শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে দু'বছর অবস্থানের পর প্রিয় ছাত্র যশোর যেলার ঝিকরগাছা উপযেলাধীন দিকদানা গ্রামের মাওলানা শামসুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান সাতক্ষীরা যেলাধীন কলারোয়া উপযেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম কাকডাঙ্গায় জীবনের শেষ স্মৃতি 'কাকডাঙ্গা আহমাদিয়া সিনিয়র মাদরাসা'র ভিত্তি স্থাপন করেন। স্বীয় উস্তাদ সমতুল্য মাওলানা আকরম খাঁকে মাদরাসা কমিটির প্রেসিডেন্ট করে তিনি এর পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নেন। বারো বৎসর এখানে কাটিয়ে ইংরেজী ১৯৬৮ সালে (১৩৭৫ বাং) ৫২ বছরের চাকুরী জীবন হ'তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবনের বাকী সাতটি বছর তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা, ফাতাওয়া-মাসায়েল ও ওয়ায-নছীহতে কালাতিপাত করেন। মৃত্যুর আগে সাড়ে চার মাস শয্যাশায়ী থাকা ব্যতীত বাকী ৫৯ বছরের কর্মজীবন তিনি দ্বীন ও সমাজের খিদমতে নিরলসভাবে ব্যয় করেন।

❑ জীবনের তিনটি স্মরণীয় ঘটনা :

(ক) বাক্যেশ্বর বাহাছ :

বাংলা ১৩২৫ সালে পশ্চিম বাংলার হুগলী যেলার অন্তর্গত দাদপুর থানাধীন বাক্যেশ্বর গ্রামে হানাফী ও আহলেহাদীছের মধ্যে একটি বিরাটাকারের 'বাহাছ' অনুষ্ঠিত হয়। আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্ত বিতর্ক সভায় 'আঞ্জুমানে আহলেহাদিস বাঙ্গালা'র মাওলানা আব্বাস আলী, মাওলানা এফাযুদ্দীন, তৎকালীন মাসিক 'আহলেহাদিস' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা বাবর আলী ও 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্সে'র প্রখ্যাত মুবাল্লিগ মাওলানা মুসলিম দানাপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম যোগদান করেন এবং প্রচলিত মাযহাবী মতবাদ সমূহের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সাফল্য লাভ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলা

ভাষায় 'বাহাছ' করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সম্পাদক মাওলানা বাবর আলীর সহযোগী হিসাবে তরুণ আলেম মাওলানা আহমাদ আলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩]

(খ) খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ্‌র সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী বিতর্ক :

সাতক্ষীরা শহরের নামকরা এলোপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ মাহতাবুদ্দীন মাওলানা আহমাদ আলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ডাক্তার ছাহেব ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী এবং নলতার পীর খান বাহাদুর মুবারক আলীর জামাতা। সেই হিসাবে পীর খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ ছিলেন ডাক্তার ছাহেবের আপন চাচা শ্বশুর। কোন এক উপলক্ষে তিনি সাতক্ষীরায় জামাতার বাড়ীতে এলে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মাওলানা আহমাদ আলীও নিমন্ত্রিত হন। মাওলানার 'নিয়ত ও দরূদ সমস্যা সমাধান' বইটি তখন বাজারে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক মুরীদের অনুরোধে খোদ পীর ছাহেব আকর্ষণীয় যুক্তির মাধ্যমে মাওলানা আহমাদ আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মাওলানা! আমি যদি আমার বন্ধুকে চিঠিতে লিখি 'তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ কর'। অথবা লিখি 'তুমি আমার হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম ভালবাসা গ্রহণ কর' তাহলে কোন চিঠিতে বন্ধু অধিক খুশী হবেন? উপস্থিত সকলেই বললেন, দ্বিতীয় চিঠিতেই অধিক খুশী হবেন। এই ভূমিকার পর জনাব পীর ছাহেব বললেন, আচ্ছা! আমরা যদি দরূদ পাঠের সময় হাদীছ অনুযায়ী কেবল *'আল্লাহুম্মা ছল্লে 'আলা মুহাম্মাদ'* না বলে *'আল্লাহুম্মা ছল্লে 'আলা সাইয়েদেনা শাফী'এনা হাবীবেনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ'* বলি, তাহলে সেটাই কি অধিক সুন্দর হয় না?

পীর ছাহেবের যুক্তির সারবত্তায় খুশী হয়ে সবাই মাওলানা আহমাদ আলীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় মাওলানা আহমাদ আলী এক গ্লাস পানি আনতে বললেন। গ্লাসটি হাতে নিয়ে তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ! ভরা এই গ্লাসটিতে এক ফোঁটা পানি নিক্ষেপ করলে যদি ফোঁটাটি ছিটকে বাইরে পড়ে যায়, তাহলে একে পূর্ণ এক গ্লাস পানি বলা যাবে। কিন্তু যদি ফোঁটাটি গ্লাসে থেকে যায় তাহ'লে বুঝতে হবে যে, ওটি পূর্ণ ছিল না। বরং ওতে এক ফোঁটা পানির জায়গা খালি ছিল। এক্ষণে আমরা যদি সবাই একথা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম একটি 'পূর্ণাঙ্গ দ্বীন' তাহ'লে সেখানে সাইয়েদেনা, শাফী'এনা, হাবীবেনা বা মাওলানার ফোঁটাগুলি দেওয়ার কোন সুযোগ আর থাকে কি?

---

৩. কলিকাতা হ'তে প্রকাশিত বাংলা ১৩২৫ সালের ৩য় বর্ষ শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা মাসিক 'আহলেহাদিস' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

বলা বাহুল্য, মাওলানা আহমাদ আলীর এই যুক্তিপূর্ণ উত্তরে সবাই খুশী হ'লেন এবং শ্রদ্ধেয় পীর ছাহেব উঠে এসে মাওলানাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

(গ) কালিগঞ্জের বাহাছ :

লাবসায় থাকাকালীন সময়ে সাতক্ষীরা যেলার কালিগঞ্জ উপযেলার জনৈক মাওলানা তমীযুদ্দীন মাওলানা আহমাদ আলীকে 'আহলেহাদীছ' আক্বীদা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি তা গ্রহণ করেন। যার ফলে সংঘটিত হয় স্মরণীয় 'কালিগঞ্জের বাহাছ'। ইংরেজী ১৯২৫ সালের ১২ ও ১৩ই মার্চে অনুষ্ঠিত এই বাহাছে হানাফী পক্ষে যোগদান করেন পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাটের ফুরফুরা দরবারের বিখ্যাত পীর মাওলানা রূহুল আমীন সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম এবং মোহাম্মাদী (আহলেহাদীছ) পক্ষে যোগদান করেন মাওলানা আহমাদ আলী, কলিকাতার মাওলানা বাবর আলী, মাওলানা এফাযুদ্দীন ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম। উক্ত বাহাছে যে আহলেহাদীছ আক্বীদার বিজয় ঘোষিত হয়, তা নীচের শালিশনামা দেখলেই বুঝা যায়। বহুল প্রচারিত উক্ত বাহাছের শালিশনামা তৎকালীন পত্রিকা হ'তে হুবহু এখানে উদ্ধৃত হ'ল। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত বাহাছে শালিশ ছিলেন শ্যামনগর উপযেলার অন্তর্গত ঈশ্বরীপুরের তৎকালীন নামকরা জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীশ বাবু।

❑ শালিশনামা :

হানিফী পক্ষ নানা কথার পর বলিয়াছিলেন যে, আগামীকল্য কোরান এবং ছহি হাদীছ হইতেই ৪ মযহাব প্রমাণ করাইয়া দেখাইব। ... আমি পরদিন (১৩-৩-২৫ইং) সকালে ৭-টার সময় সভারম্ভের পূর্বেই সভায় আসি। ... পূর্বদিনের কথামত শ্রীযুক্ত মৌলানা রুহুল আমিন ছাহেব কোরান ও ছহি হাদীছ হইতে কোন প্রমাণ না দেখাইয়া তফসীর হইতে প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিলে মোহাম্মদী পক্ষ হইতে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হয়। স্থানীয় সুশিক্ষিত মুসলমান সাব ইন্সপেক্টর মহাশয়দ্বয়ও আপত্তি করেন। তথাপি কোরান ও ছহি হাদীছ হইতে প্রমাণ দেখান নাই। তাহাতে সকলেই ক্রমশঃ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া আমারও বিশ্বাস হয় যে, কোরান ও ছহি হাদীছে চার মযহাব নাই। ... শ্রীযুক্ত মৌলানা রুহুল আমিন ছাহেব বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার কথা শেষ করিয়াই তিনি মোহাম্মদী দলের বা আমরা কি উপস্থিত ভদ্রলোকগণের কোন প্রকার মত না লইয়া 'সভা ভঙ্গ হইল' বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সভাটি ভাঙ্গিয়া দেন।

আমার বিশ্বাস হানিফী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাষ্পদ মৌলানা শ্রীযুক্ত রুহুল আমিন ছাহেব সুপণ্ডিত ও সুবক্তা হইলেও একরারের লিখিত বিষয়ের কোন মীমাংসার চেষ্টা না করিয়া অন্যান্য বিষয়েরই সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করেন।

স্বাক্ষর :

ঈশ্বরীপুর শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯-৩-২৫ অধিকারী।

[সূত্র : মাসিক আহলেহাদিস, ১১শ বর্ষ অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৩২ সাল]

জনশ্রুতি আছে যে, মাওলানা রূহুল আমীন কর্তৃক অবৈধভাবে সভা ভঙ্গের সাথে সাথে 'মোহাম্মদী দলের পরাজয়' মর্মে আগে থেকে ছাপিয়ে আনা শত শত বিজ্ঞাপন লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

❑ সমাজ সংস্কার :

(ক) তামাক বিরোধী আন্দোলন : হাকিমপুরে অবস্থানকালে কর্ম জীবনের শুভ সূচনাতেই মাওলানা আহমাদ আলী হুঁকা-তামাক ও সিগারেট বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা 'তামাক বিরোধী আন্দোলন' রূপে খ্যাতি লাভ করে। এদেশে প্রথম সিগারেট চালুকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ নীতির অংশ হিসাবে মাওলানার এই আন্দোলন তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে।

(খ) কবরপূজা বিরোধী আন্দোলন :

মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী। বিশেষ করে মৃত পীরের অসীলায় মুক্তি পাওয়ার ধোঁকায় পড়ে হাযার হাযার মুসলমান যেভাবে কবরপূজার শিরকে লিপ্ত হচ্ছে, তিনি আজীবন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন।

(গ) বন্ধকী প্রথা বিলোপ আন্দোলন :

বন্ধকী প্রথার নামে যে গলাকাটা সূদীপ্রথা গ্রামে-গঞ্জে চালু আছে, তিনি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং ওয়ায-নছীহত ও লেখনীর মাধ্যমে এই অত্যাচারমূলক অর্থলগ্নিপ্রথা বিলোপের চেষ্টা চালিয়ে যান। দুঃখের বিষয় হ'ল, মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অর্থশালী কিছু লোক আসল টাকা ছাড়াও জমির ফসল লাভের এই অতি লাভজনক সূদী কারবারে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অনেক আলেমও এই কাজে জড়িয়ে ছিলেন ও এর পক্ষে ফৎওয়া দিতেন। মাওলানা আহমাদ আলী সর্বদা তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করে গেছেন।

(ঘ) ঐক্যবদ্ধ জুম‘আ মসজিদ ও ঈদগাহ কায়েম :

তিনি বিভিন্ন জুম‘আ মসজিদকে ওয়াক্তিয়া করে দিয়ে সকলের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে জুম‘আ মসজিদ কায়েম করতেন। একইভাবে তিনি একাধিক ঈদগাহকে একটি ঐক্যবদ্ধ ঈদগাহে পরিণত করতেন। এ জন্য প্রথমে নিজ এলাকায় বুলারাটি, মাহমূদপুর ও তালবেড়ের তিনটি ঈদগাহ একত্রিত করে বর্তমানের ‘ছাদেকের আমবাগানে’ ঐক্যবদ্ধ ঈদগাহ কায়েম করেন। যা আজও আছে। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের উদ্যোগে ১৯৯১ সালে ঈদগাহ্র আয়তন বৃদ্ধি করা হয় এবং চারপাশে পাকা প্রাচীর দেওয়া হয়। অতঃপর ২০১১ সালের নভেম্বরে তার উদ্যোগে সর্বপ্রথম ঈদগাহ অভিমুখী রাস্তা নির্মান করা হয়।

(ঙ) জনস্বাস্থ্য সেবায় অবদান :

সে যুগে সাধারণতঃ বন-জঙ্গল ও বাঁশঝাড়ের আড়ালে পেশাব-পায়খানা সারা হ’ত। মাওলানা এগুলির বিরুদ্ধে সর্বদা কঠোর ছিলেন। তিনি ছাত্রদের নিয়ে কাঁচা পায়খানা ঘর বানাতেন এবং যেখানে জালসা করতে যেতেন, সেখানে আগেই খোঁজ নিতেন পায়খানা ঘর আছে কি-না। না থাকলে করার তাকীদ দিতেন। এভাবে গ্রামে-গঞ্জে স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সেবায় বড় ভূমিকা রাখতেন।

❑ রাজনৈতিক জীবন :

তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। পাকিস্তান দাবীর পক্ষে হাঁ-না ভোটে সাতক্ষীরা অঞ্চলে ১৯৪৬ সাথে তৎকালীন মুসলিম লীগের প্রতিনিধি ডাঃ আব্দুল আহাদের পক্ষে তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ আল-বাকী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময় তার পদ্যছন্দে লিখিত পুস্তিকা ‘পাকিস্তান গীতিকা’ খুবই জনপ্রিয় ছিল। যার প্রথম লাইন ছিল *‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, কবুল মোদের জান-পরান’*। তিনি বলেন, এ সময়কার প্রায় সকল জনসভায় আব্বা সভাপতিত্ব করতেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের দিকে সাতক্ষীরার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন আব্বা, লাবসার আলম মাস্টার, ডাঃ মাহতাবুদ্দীন, রসূলপুরের আব্দুল বারী খাঁ, শ্রীউলার জামালুদ্দীন, সুলতানপুরের আহমাদ মোক্তার প্রমুখ। শেষোক্ত জনের বাড়ীতে সাতক্ষীরা মুসলিম লীগের অফিস ছিল।’

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হ’ল। অথচ খুলনা ও সাতক্ষীরায় পাকিস্তানের পতাকা উড়লো না। তখন মূলতঃ সবুর খানের চেষ্টায় এবং আমাদের মিছিল-মিটিং ও আন্দোলনের ফলে ১৭ই আগষ্ট তারিখে এই সব শহরে ফ্লাগ ওঠে এবং আমিই প্রথম সাতক্ষীরা ডাক বাংলো (আই. বি) রেস্ট হাউসে পাকিস্তানের পতাকা উড়াই। আব্বা ছিলেন এসব আন্দোলনের প্রাণপুরুষ।

সেসময়কার কথা বলতে গিয়ে সাতক্ষীরার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডাঃ আফতাবুজ্জামান (৭৩) (পিতা : ডাঃ মাহতাবুদ্দীন) বলেন, ঐ সময় আমি ছোট ছিলাম। আমি দেখেছি, বাকী ভাইয়ের নেতৃত্বে পাকিস্তানের পক্ষে বিরাট মিছিলের চেহারা। সাতক্ষীরার রাজনৈতিক নেতারা দু'দিনের মধ্যেই ১৪ হাযার টাকা কালেকশন করে কলিকাতায় যান ও সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে খুলনা ও সাতক্ষীরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করাতে সক্ষম হন। সেদিন তাঁরা ব্যর্থ হ'লে আজ আমাদের ভারতের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতে হ'ত। তাই তাঁদের সেদিনকার অবদান কখনোই ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়।[৪]

জনাব আব্দুল্লাহ আল-বাকী বলেন, আব্বার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং তিনি ছিলেন তাঁর বিশ্বাসে অবিচল ও নিষ্ঠাবান। যখন পাকিস্তান-এর প্রস্তাবক শেরে বাংলা ফজলুল হক 'মুসলিম লীগ' থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'কৃষক-প্রজা পার্টি' খাড়া করে পাকিস্তানের বিপক্ষে 'কংগ্রেস'-এর পক্ষ নিলেন। মাওলানা মওদূদী 'জামায়াতে ইসলামী' বানিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গেলেন, তখন আব্বা সবসময় আমাদের উৎসাহ দিয়ে বলতেন, দেখ, পাকিস্তান না হ'লে চিরদিন তোমাদের হিন্দু নেতাদের গোলামী করতে হবে। তারা এখনকার মত আগামীতেও তোমাদের শোষণ করবে এবং জান-মাল ও ইযযতের উপর হামলা চালাবে। অতএব নেতারা যতই বেঈমানী করুক, তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে অবিচল থাক। বস্তুতঃ আব্বার কারণে সাতক্ষীরা মুসলিম লীগে কোন ভাঙন ধরেনি।[৫]

মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্র বলেন, ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর বৈরুতের এক হোটেলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মারা গেলে আব্বা কাকডাঙ্গা মসজিদে আমাদের সামনে কেঁদে ফেলেছিলেন এবং তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ১৯৪৬ সালে কলিকাতার রায়টের সময় সোহরাওয়ার্দী যদি না থাকতেন, তাহ'লে কত মুসলমান যে ঐ সময় হিন্দুদের হাতে খুন হ'ত, তার হিসাব থাকত না। তিনি বলেন, সোহরাওয়ার্দী (তৎকালীন বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী) ঐ সময় নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সশস্ত্র হিন্দু গুণ্ডাদের সামনে দু'হাত উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, *'এক মুসলিম কো মারনে সে পহেলে তোম মুঝে ক্বতল করো'* (একজন মুসলমানকে হত্যা করার আগে তোমরা আমাকে হত্যা কর)। তাঁর এই দুঃসাহসিক ভূমিকার ফলে হিন্দুরা পিছিয়ে যায়।

---

৪. সাক্ষাৎকার ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১০ খৃঃ।
৫. সাক্ষাৎকার ২৫/১২/২০১১ খৃঃ।

মাওলানা আহমাদ আলী সক্রিয় রাজনীতিতে কখনই জড়িত হননি। কিন্তু সাতক্ষীরা যেলা ও নিজ ইউনিয়ন ৭নং আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তাঁর নৈতিক সমর্থনের উপর অনেকের বিজয় নির্ভর করত। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের জন্য ইউনিয়নবাসীর আন্তরিক আবেদন ও অবশেষে সম্মিলিত চাপের মুখে তিনি তাঁর ইলমী ও তাবলীগী তৎপরতা ব্যাহত হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

এ বিষয়ে একটি সরস গল্প মাওলানা প্রায়ই শিষ্যদের সামনে বলতেন যে, একদিন আমি শনিবার ভোরে বাড়ী থেকে লাবসা মাদরাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে মসজিদের সামনে কদবেল তলায় এসে দেখি ইউনিয়নের নামকরা 'কাদের ডাকাত' তার দলবল নিয়ে রাস্তায় শুয়ে আছে। আমাকে দেখে ওরা শুয়ে থেকেই সালাম দিল। আমি বললাম, তোমরা এভাবে এখানে কেন? আব্দুল কাদের বলল, আমাদের দাবী আপনি এবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে 'প্রেসিডেন্ট' পদে দাঁড়াবেন। তাহ'লে আর কেউ প্রার্থী হবে না। আপনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'প্রেসিডেন্ট' হবেন। মাওলানা কিছুটা ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা আব্দুল কাদের! আমি যখন সাইকেলে যাই, তখন বুলারাটি থেকে লাবসা পর্যন্ত ৮ মাইল রাস্তার মধ্যে যত লোকের সাথে সাক্ষাত হয়, প্রায় সকলেই আমাকে সালাম করে। এমনকি দারোগা-পুলিশও আমাকে সালাম দেয়। এখন তুমিই বল, কাল যখন আমি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হব, আর যদি তোমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, তখন আমাকে গিয়ে থানার দারোগাকে সালাম দিতে হবে তোমাকে ছাড়ানোর জন্য। বিষয়টি কি তুমি মেনে নিতে পারবে? এটুক কথাতেই কাজ হ'ল। আব্দুল কাদের তার বাহিনীসহ অবরোধ উঠিয়ে নিল এবং উস্তাদজীর কাছ থেকে দো'আ নিয়ে বিদায় হ'ল এই বলে যে, 'আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের উস্তাদজীকে কারু কাছে নীচু হ'তে দেব না'।

❑ সাংগঠনিক জীবন :

খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, চব্বিশ পরগনা, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা হিসাবে মাওলানা আহমাদ আলী সমধিক পরিচিত ছিলেন। তবে ১৯৪৭-এর পরে তাঁর প্রায় সকল কর্মোদ্যোগ পূর্ব পাকিস্তানেই (বর্তমান বাংলাদেশে) কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে।

বিশৃংখল সমাজকে তিনি ধর্মীয়ভাবে সংগঠিত করে গড়ে তোলার বাসনা পোষণ করতেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সম্ভবতঃ ১৯৪৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের চণ্ডীপুরের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল মান্নান আল-আযহারীকে (মৃত্যু ১৯৮৪ সালে খুলনার আড়ংঘাটায়) সভাপতি ও স্বীয় প্রিয় ছাত্র যশোরের মৌলবী শামসুদ্দীনকে

সম্পাদক করে 'জমঈয়তে ওলামায়ে মোহাম্মাদিয়া' গড়ে তোলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উক্ত সংগঠন নবগঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। প্রথমোক্ত সংগঠনে ও শেষোক্ত সংগঠনের খুলনা-যশোর যেলা শাখার তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। তবে নির্মাতা এবং ঐক্যের প্রতীক হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল সবার ঊর্ধ্বে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত ভূমিকা পালনে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সর্বদা গঠনমূলক চিন্তার অনুসারী ছিলেন। জামা'আতের যেখানেই কোন গণ্ডগোল দেখতেন, সেখানেই সেটা মিটিয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

দাওয়াতী জীবন :

মাওলানা আহমাদ আলীর জীবনটাই ছিল মূলতঃ দাওয়াতী জীবন। তাঁর জালসাগুলিতে দলমত নির্বিশেষে সকল ধরনের মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ত। তাঁর মিষ্টভাষী বক্তৃতা, মধুকণ্ঠের হাম্‌দ ও ছানা, *নাহমাদুহূ...* সূরের অপূর্ব মূর্চ্ছনা, *'মুহাম্মাদ মোছতফা নবী শাফীউল্লেল মোযনাবীনো, হাশরে কাণ্ডারী হয়ে ভক্তগণে তরাবে গো'* ধ্বনির অনুরণন আজও প্রবীণ ভক্তদের মুখে শোনা যায়। শ্রোতাদের মধ্যে খুব কমই থাকত, যাদের চোখ বেয়ে পানি ঝরতো না। সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় তিনি বেশীর ভাগ সময় দাওয়াতী সফরে কাটাতেন।

খুলনার দক্ষিণাঞ্চল ছিল আজকের মত তৎকালীন যুগেও একটি অবহেলিত এলাকা। এই এলাকার মানুষ গোরপূজা, পীরপূজা প্রভৃতি রকমারি শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজে হাবুডুবু খাচ্ছিল। মাওলানা আহমাদ আলী এ এলাকায় তাঁর দাওয়াতী অভিযান চালিয়ে যান। ফলে আশাশুনি, পাইকগাছা, কয়রা উপযেলার বহু এলাকা আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়। দক্ষিণ খুলনা ছাড়াও খুলনা সদর, বাগেরহাট, মোল্লাহাট ও তেরখাদা অঞ্চলের শত শত মানুষ তাঁর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করে ও আহলেহাদীছ হয়।

তাঁর নিঃস্বার্থ তাবলীগী সফরের কারণে আজ শিবসা নদীর তীরবর্তী সুন্দরবনের সর্বশেষ মুসলিম জনপদ নলিয়ান, সুতারখালী ও কালাবগীতে আহলেহাদীছ-এর সন্ধান পাওয়া যায়। গত ২০০৯ সালের ১লা জুন সোমবারে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস 'আইলা' দুর্গত এই এলাকায় ত্রাণসাহায্য নিয়ে গেলে দক্ষিণ কালাবগীর মনছূর রহমান খান (৭৫), মিশকাত শেখ (৬৫), আহমাদ আলী শেখ (৭০) প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ সমাজ নেতাগণ মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্র ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার আব্বাই আমাদেরকে

প্রথম 'মুসলমান' বানিয়েছেন। মেশকাত শেখ বলেন, আমার ছোট দাদা নঈমুদ্দীন শেখ আপনার আব্বার হাতে বায়'আত করে 'আহলেহাদীছ' হন। আশপাশের বিদ'আতী মৌলবীরা তাঁর সঙ্গে বাহাছ করে সর্বদা পরাজিত হ'ত। যার ফলে আজ নলিয়ান, সুতারখালি ও কালাবগীর অধিকাংশ মানুষ আহলেহাদীছ মুসলমান হিসাবে জীবন যাপনের সৌভাগ্য লাভ করেছে। দক্ষিণ কালাবগীর আমীনুল ইসলাম সানা সরাসরি বলেন, গত ২১/০৩/২০০৯ ইং তারিখে খুলনার হাদীছ পার্কে আপনার ভাষণ শুনে আমি আহলেহাদীছ হয়েছি। উল্লেখ্য যে, মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্রের উদ্যোগে উত্তর কালাবগীতে ১৯৯২ সালে সর্বপ্রথম কুয়েতী দাতা সংস্থার মাধ্যমে মোজাইক করা পাকা মসজিদ করা হয় এবং মিঠা পানির জন্য পুকুর কাটা হয়।

পরের দিন ২রা জুন একই উদ্দেশ্যে সাতক্ষীরার আশাশুনি উপযেলাধীন বিছট-গরালী এলাকায় গেলে গরালীর জনৈক প্যারালাইসিসে আক্রান্ত নবতিপর অতিবৃদ্ধ মুরব্বী তাঁর ছেলে ও পোতাদের সাহায্যে মসজিদের কাছে এসে রাস্তায় বসে মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্রের গায়ে হাত বুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাওলানার স্মৃতিচারণ করে তাঁর প্রশংসায় বহু কথা বলেন। তাঁর সফরসঙ্গী মেজ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীবের হাত দু'টি বুকের মধ্যে নিয়ে বলেন, হায় আমার কি সৌভাগ্য যে, আমার উস্তাদের ছেলে ও পোতাকে এক সাথে দেখতে পেয়েছি, বলে তিনি প্রাণভরে দো'আ করেন। উল্লেখ্য যে, মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্র কুয়েতী দাতা সংস্থার মাধ্যমে অত্রাঞ্চলের গরালী (১৯৮৯), রাজাপুর-পূর্বপাড়া (১৯৯০), কয়রার মহারাজপুর মধ্যপাড়া (১৯৯৫), বিছট (১৯৯৬), লাঙ্গলদাড়িয়া (১৯৯৯) প্রভৃতি গ্রামে পাকা মসজিদ করেন। অতঃপর ২০০৯ সালে কয়রা, শ্যামনগর, আশাশুনির 'আইলা' দুর্গত এলাকায় ত্রাণসাহায্য ছাড়াও তার সংগঠনের মাধ্যমে ৩৫টি গভীর নলকূপ বসানো হয়। মূলতঃ এসবই মরহূম মাওলানা আহমাদ আলীর তৈরী করা জমিতে আবাদ করা মাত্র।

গরালী-বিছট এলাকা ছিল সেযুগে ডুবো এলাকা। প্রধানতঃ মাছ ধরাই ছিল অধিকাংশ লোকের পেশা। ধর্মীয় দিক দিয়ে মানুষ ছিল অন্ধকারে। মাওলানা তখন এ অঞ্চলে এসে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেন ও তাদেরকে শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত করেন। ফলে আশপাশের ৫/৭টি গ্রাম আহলেহাদীছ হয়ে যায়। বহু হিন্দু মুসলমান হয়। লোনা পানির এলাকা শুকনা মওসুমে ছোট ছোট খাল ও নালায় বিভক্ত থাকত। মাওলানা এ সময় গামছা পরে এই সব খাল পার হ'তেন। সঙ্গে লবণ থাকত। কেননা বড় বড় শাপনা ঘাসের মধ্যে নানা সাইজের জোঁক বাসা বেঁধে থাকত। এরা নিঃসাড়ে দু'পায়ে কামড়ে ধরে রক্ত চুষে খেত। সমস্ত রক্ত চুষে জোঁকগুলো মোটা হয়ে ঝুলে থাকত। অতঃপর দু'হাতে লবণ মাখিয়ে সেগুলো সরিয়ে দেবার সময় সমস্ত পা রক্তে লাল হয়ে যেত। এভাবে

কাদা-পানির মধ্য দিয়ে হেঁটে সাতক্ষীরা থেকে বিছট, গরালী, নাকনা, রাজাপুর, কলিমাখালি, লাঙ্গলদাড়িয়া, একশরা প্রভৃতি এলাকায় তিনি যেতেন ও পথভোলা মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকতেন। আজ তাঁরই চাষ করা এই সব এলাকা বিরাট সংখ্যক 'আহলেহাদীছ এলাকা' হিসাবে সুপরিচিত। বর্তমানে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের সাংগঠনিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলে দাওয়াতের পরিধি আশাশুনি ছাড়িয়ে শ্যামনগরের বিরাট এলাকায় প্রসারিত হয়েছে। কালিগঞ্জ উপযেলাতেও কার্যক্রম ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

কুয়েতী দাতাসংস্থার সাহায্যে ইংরেজী ১৯৮৯ সালে গরালীতে করা পাকা মসজিদ উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গরালী গেলে মসজিদের প্রতিবেশী এক বাড়ীতে নাশতার দাওয়াত দিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। তিনি গিয়ে মাটির ঘরের বারান্দায় বসলেন। মাদুরের উপর কাঁথা বিছানো। একটু দূরে বসা বৃদ্ধা এবার তার স্মৃতিচারণ করতে শুরু করলেন। বললেন, আপনার আব্বা এতদঞ্চলে সকলের উস্তাদ। কিন্তু আমার নিকট তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে মেয়ের মত করে 'মা' বলে ডাকতেন। এই বারান্দায় এভাবেই তিনি বসতেন। মাদুরের উপর কাঁথা না বিছানো থাকলে তিনি বসতেন না। মেয়ের মতই তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। আবার বকাঝকা করতেন। এখানে আমার কাছেই তিনি খেতেন। তিনি কি কি পসন্দ করতেন, আমি জানতাম ও সেভাবেই রান্না করতাম। একদিন মাছ ঝোলে ভুলক্রমে লবণ বেশী হয়ে গেল। আব্বা এমন ক্ষেপে গেলেন যে, মাছ সমেত কাঁসার বাটি বারান্দা থেকে উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি আজও সেই কাঁসার বাটিটা স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছি। ওটা আমার জন্য পিতার আশীর্বাদ স্বরূপ। ওটা দেখে আমি তাঁর স্নেহ অনুভব করি। আজ আপনি এসেছেন শুনে অতি যতনে তুলে রাখা সেই বাটি বের করেছি এবং আপনাকে সেই বাটিতে করে মাছ ঝোল দিয়েছি। আপনি খেলে আমি হৃদয়ে শান্তি পাব। বলেই তিনি হু হু করে কাঁদতে লাগলেন।

আহলেহাদীছ জামা'আতের তৃণমূল পর্যায়ে মাওলানা কতটা জনপ্রিয় ছিলেন, উক্ত ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

❑ বাগ্মিতা :

মাওলানা আহমাদ আলী ছিলেন অপূর্ব বাগ্মিতার অধিকারী। শিক্ষা জীবন শেষে অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি এতদঞ্চলের সেরা বাগ্মীরূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের অনলবর্ষী বক্তৃতা যিনিই শুনতেন, তিনিই মুগ্ধ হ'তেন। বক্তৃতার শুরুতে অপূর্ব সুরছন্দে পারস্য কবি রূমীর অমর কাব্য 'মছনবীর' বায়েতগুলি যখন তাঁর কণ্ঠে ঝংকৃত হ'ত, তখন সভাস্থ সকলে

মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শ্রবণ করতো। জীবনের শেষ দিকেও যখন তিনি সভাশেষে সভাপতির ভাষণ দিতেন ও কাতর কণ্ঠে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতেন, তখনো তাঁর মিনতিভরা অপূর্ব স্বরলহরী শ্রোতৃমণ্ডলীকে অন্য জগতে নিয়ে যেত। এই সময় কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারত না। বাগ্মীতার সাথে সাথে তাঁর ভক্তকুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে সর্বত্র। মুকন্দপুরের ভক্তরা তাদের ইসলামী জালসায় একবার তাঁকে বাড়ী থেকে পালকীতে করে নিয়ে যায় তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

❑ লেখনী :

মাওলানা আহমাদ আলী ছাত্রজীবন থেকেই লেখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তবে বই আকারে তাঁর লেখা বের হয় অনেক পরে। এ ব্যাপারে মরহূম মাওলানা আকরম খাঁর উৎসাহ দানের কথা তিনি সবসময়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। ১৯৬৭ সালের দিকে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে সাথে নিয়ে ঢাকায় দৈনিক আজাদ অফিসে মাওলানা আকরম খাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তখন তাঁর হাতে ছিল স্বলিখিত পুস্তক 'আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মযহাবে আহলেহাদীছ'। মাওলানা আকরম খাঁ পুত্রসহ প্রিয় শিষ্যকে সামনে দেখে আনন্দের সাথে স্বাগত জানালেন ও বললেন, তোমার হাতে ওটা কি? মাওলানা আহমাদ আলী বইটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। মাওলানা এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, 'আহমাদ আলী তুমি যে লিখতে শিখেছ'। জওয়াবে তিনি বলেন, 'হুযুর! সমাজ ও জামা'আত নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকি। ঠাণ্ডা মাথায় লেখার সময় পাই না'। মাওলানা বললেন, 'আহমাদ আলী। মনে রেখ এ পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে, তা ব্যস্ত লোকেরাই করেছে। অলসরা কিছুই করেনি'।

তিনি ছোট-বড় সর্বমোট ষোলখানা বই লিখেছেন। তন্মধ্যে চারখানা পাণ্ডুলিপি আকারে এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। বাকী বারোখানা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ বইগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

১। সংসার পথে (পদ্য ছন্দে) : নবদম্পতির প্রতি ইসলামী আদব সম্বলিত উপদেশমালা। প্রথম প্রকাশ ১৩৩৪ বাংলা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২, রুবি প্রেস, যশোর। ২য় প্রকাশ ১৩৬৪।

২। তাহারৎ (পদ্য ছন্দে) : নারী-পুরুষের পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত মাসায়েল। ১ম প্রকাশ ১৩৩৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২, রুবি প্রেস, যশোর। ২য় প্রকাশ ১৩৬৪।

৩। আকীদায়ে মোহাম্মদী বা মযহবে আহলেহাদীছ : আহলেহাদীছের আকীদা বিষয়ক আলোচনা। ১ম প্রকাশ ১৩৫৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪, রুবি প্রেস, যশোর। ২য় প্রকাশ ১৩৬৯, দি মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং প্রেস, আপার খান জাহান আলী রোড (ফেরীঘাট মোড়), খুলনা।

৪। ছলাতে মোস্তফা বা আদর্শ নামায শিক্ষা : ১ম প্রকাশ ১৩৬০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩১, রুবি প্রেস, যশোর।

৫। নিয়ত ও দরূদ সমস্যা সমাধান; বিতর্ক ও বিচার : ছালাতের শুরুতে মুখে আরবীতে নিয়ত পড়ার অযৌক্তিকতা ও প্রচলিত রকমারি ভিত্তিহীন দরূদ সমূহের প্রতিবাদে লিখিত। ১ম প্রকাশ ১৩৬১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮,প্যারাডাইস প্রেস, ১০নং স্যান্ডেল স্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বঙ্গানুবাদ খোৎবা : জুম'আ, উভয় ঈদ ও বিবাহের মোট ১১টি আরবী খুৎবা বঙ্গানুবাদসহ। খুৎবাগুলি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক; চাঁদভিত্তিক নয়। ১ম প্রকাশ ১৩৬২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬ (বড় সাইজ), আনছার প্রেস, যশোর। ২য় প্রকাশ ১৩৬৯, দি মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং প্রেস, খুলনা। ৩য় প্রকাশ ১৩৮৪ (১৯৭৭ ইং) পুরাতত্ত্ব প্রেস, ১৯ নবরায় লেন, জিন্দাবাহার, ঢাকা-১। কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কর্তৃক সংযোজিত ও পরিবর্ধিত বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ২১টি খুৎবাসহ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬।

৭। ছলাতুন্নবী বা মক্তব-মাদরাসার আদর্শ নামায শিক্ষা : ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'ছলাতে মোস্তফার' তুলনায় অধিকতর সহজ ভাষায় ও সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত। ১ম প্রকাশ ১৩৬৪, ২য় প্রকাশ ১৩৬৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬, রুবি প্রেস, যশোর। ৩য় প্রকাশ ১৩৮৩, বৈকালী প্রেস, খুলনা।

৮। সূরা ফাতেহা পাঠের সমস্যা সমাধান : ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য ছালাতে সূরা ফাতেহা যে অবশ্যই পড়তে হবে, সে বিষয়ে দলীলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। ১ম প্রকাশ ১৩৬৪, পৃঃ সংখ্যা ৪৮, রুবি প্রেস, যশোর।

৯। সশব্দে আমীন সমস্যা সমাধান; বিতর্ক ও বিচার : উস্তাদ-শিষ্যের আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেহরী ছালাতে সূরা ফাতেহা শেষে ইমাম ও মুক্তাদী সবাইকে যে আমীন সশব্দে বলতে হবে, সে বিষয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা। ১ম প্রকাশ ১৩৬৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬, রুবি প্রেস, যশোর।

১০। তারাবীহ সমস্যা সমাধান : ছালাতে তারাবীহ্‌র রাক'আত সংখ্যা বিশ নয় বরং আট রাক'আতই যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পালিত সুন্নাত সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা। ১ম প্রকাশ ১৩৬৬, পৃঃ সংখ্যা ৪৮, রুবি প্রেস, যশোর।

১১। রাফ'উল ইয়াদায়েন ও বুকের উপর হাত সমস্যা সমাধান : ছালাতে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়ানো এবং রুকূতে যাওয়ার কালে, রুকূ হ'তে উঠার সময় ও তৃতীয় রাক'আতে উঠে দাঁড়ানোর সময় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো যে সুন্নাত, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা। ১ম প্রকাশ ১৩৬৯, পৃঃ সংখ্যা ১২০, দি মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং প্রেস, খুলনা।

১২। কুরআন ও কলেমাখানী : মৃতের নামে কুলখানী, চেহলাম ও ফাতেহাখানী করা, কুরআন খতম করে বখশে দেওয়া ও তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা প্রভৃতি প্রচলিত বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক আলোচনা। ১ম প্রকাশ ১৩৭৫, পৃঃ সংখ্যা ৫৪, রুবি প্রেস, যশোর।

মরহূম মাওলানা আহমাদ আলীর অপ্রকাশিত চারখানা পাণ্ডুলিপির নাম হ'ল : (১) তিন তালাক সমস্যা সমাধান (২) বঙ্গানুবাদ মীযানুছ ছরফ (৩) হাদীছে আরবাঈন বা চল্লিশ হাদীছ (৪) সরল আরবী ব্যাকরণ।

তিনি তাঁর সাহিত্যে বংকিম-রবীন্দ্রের অনুসারী ছিলেন না। বরং আরবী-ফার্সী মিশানো বাংলা ব্যবহার করতেন। যা বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ধারা প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

❑ আজীবন শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সেবক :

মাওলানা আহমাদ আলী ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী। তাঁর ৫৯ বছরের সুদীর্ঘ কর্মজীবনের ৫২ বছরই ছিল শিক্ষকতার জীবন। শিক্ষায় পশ্চাৎপদ তৎকালীন দক্ষিণ বাংলার মুসলিম সমাজে দ্বীনী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি প্রায়ই বলতেন, শুধুমাত্র ওয়ায-নছীহত আর মৌখিক তাবলীগের দ্বারা সমাজ সংস্কার সম্ভব নয়। বরং এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন এলাকায় অধিকসংখ্যক দ্বীনী শিক্ষাগার তৈরী করে মুসলিম তরুণদেরকে তাদের নিজস্ব শিক্ষায় গড়ে তোলা। ফলে যে যুগে মাদরাসা শিক্ষাকে 'ফকীরী বিদ্যা' বলে ঠাট্টা করা হ'ত এবং বিশেষ করে আলিয়া নেছাবের মাদরাসাকে বিদ'আত বলে ফৎওয়া দেওয়া হ'ত, সেই প্রতিকূল পরিবেশে সকল প্রকারের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে তিনি স্বীয় উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় খুলনা, যশোর, ২৪ পরগনা তথা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় ছোটবড় সর্বমোট ৫৫টি মাদরাসা ও ১১টি মসজিদ কায়েম করেন। তবে কয়েকটি বাদে অধিকাংশ মাদরাসাই বর্তমানে স্কুল, হাইস্কুল বা কলেজে রূপ নিয়েছে অথবা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সবশেষে বর্তমান সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন সীমান্তবর্তী গ্রাম কাকডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর জীবনের শেষ কীর্তি 'কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা'। তার আগে তিনি সাতক্ষীরা সদর উপযেলাধীন ঝাউডাঙ্গা বাজার জামে মসজিদে একটি খারেজী মাদরাসা কায়েমের উদ্দেশ্যে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে

দু'মাস যাবত ক্লাস চালিয়ে যান এবং 'ছাত্র চাই' বলে বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় ছাত্র সংগ্রহ না হওয়ায় অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে ঐ পরিকল্পনা বাদ দেন এবং কাকডাঙ্গাতে **১৯৫৬** সালে আলিয়া মাদরাসা কায়েম করেন এবং এটাই ছিল তাঁর গড়া প্রথম 'আলিয়া' মাদরাসা। **১৯৬৮** সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। গুণমুগ্ধ জনসাধারণ তাঁর নিঃস্বার্থ খিদমতকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর নামে মাদরাসার নাম রাখেন 'কাকডাঙ্গা আহমাদিয়া সিনিয়র মাদরাসা'। পাথরঘাটায় থাকাকালীন সময়ে তিনি নিকটস্থ ঝাউডাঙ্গা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এর উন্নয়নের জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর কর্মজীবনের অমলিন স্মৃতি কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা ও ঝাউডাঙ্গা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ অদ্যাবধি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছাত্রবৃন্দ :

তাঁর অগণিত ছাত্রের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম এখানে প্রদত্ত হ'ল।-

যেলা সাতক্ষীরা : ১। মাওলানা আব্দুর রঊফ, পাথরঘাটা ২। মাওলানা আব্দুল করীম, ঐ, শিক্ষক ঝাউডাঙ্গা মাদরাসা ৩। মাওলানা সাখাউদ্দীন, সাতক্ষীরা পি. এন. হাইস্কুল ৪। মুহাম্মাদ সাঈদ (লাবসা) হেড পোষ্ট মাষ্টার, সাতক্ষীরা প্রধান ডাকঘর ৫। শেখ আব্দুল হক (লাবসা), সচিব, বাংলাদেশ সরকার ৬। শেখ আতাউর রহমান (লাবসা), সচিব, বাংলাদেশ সরকার ৭। শেখ মুশতাক আহমাদ, এডভোকেট, সাতক্ষীরা জজকোর্ট ৮। শামসুল হক- **১**, এডভোকেট, ঐ ৯। মৌলবী এলাহী বখ্শ খানপুরী **১০**। মৌলবী আব্দুল আযীয (মুরারীকাটি), প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কলারোয়া মহাবিদ্যালয়, কলারোয়া **১১**। মাওলানা কফীলুদ্দীন, নাকনা, আশাশুনি **১২**। শেখ আশরাফুল হক, সাতক্ষীরা পৌর মেয়র।

যেলা যশোর : ১। মৌলবী শামসুদ্দীন, দিকদানা, উপযেলা ঝিকরগাছা ২। মৌলবী কফীলুদ্দীন, কেশবপুর ৩। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম (জাহানপুর, কেশবপুর) ৪। মাওলানা আবূবকর, হলিধানী, ঝিনাইদহ, সুপার, হাড়াভাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা, মেহেরপুর।

যেলা খুলনা, বাগেরহাট ও ফরিদপুর : ১। মৌলবী আব্দুছ ছামাদ (কামালনগর, সাতক্ষীরা) ২। মাওলানা আব্দুর রহমান (কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা) ৩। মাওলানা মুনীরুল হোদা (কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা) ৪। ক্বারী আব্দুল মান্নান আরশাদ, ফারেগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, নাচুনিয়া, তেরখাদা উপযেলা, খুলনা ৫। মাওলানা আনোয়ার হোসাইন, পাইকগাছা, খুলনা সদর ৬। মাওলানা আযীযুর রহমান ছিদ্দীকী, নগরকান্দা, মোল্লাহাট, বাগেরহাট ৭। মাওলানা রফীকুল ইসলাম, কাহালপুর, ঐ ৮। মাওলানা মনীরুযযামান, রাজপাট, ঐ ৯। মাওলানা আব্দুল

বারী, আড়ুয়াবর্ণি, চিতলমারী, বাগেরহাট ১০। মাওলানা ছিদ্দীকুর রহমান, শেখর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর ১১। মাওলানা দীন মুহাম্মাদ, বহলতলী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর চব্বিশ পরগণা, ভারত : ১। মৌলবী যমীরুদ্দীন, ঘোড়ারাস, বসিরহাট ২। মাওলানা ফযলুল হক, ঐ ৩। ইউসুফ শেখ, ঐ ৪। জামাত আলী শেখ, ঐ ৫। লুৎফর রহমান, ঐ এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আব্দুশ শুকুর, এনায়েতনগর।

সুদীর্ঘ অর্ধ শতাধিককাল শিক্ষকতার জীবনে তিনি হাযার হাযার ছাত্রের বরণীয় উস্তাদ হওয়ার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। তাঁর আমলে বাগেরহাট, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর ও বিশেষ করে সাতক্ষীরা এলাকার বড় বড় আলেম ও উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক বাদে প্রায় সকলেই তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বর্তমানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চপদস্থ তাঁর বহু ছাত্রের মুখে 'আদর্শ শিক্ষক' হিসাবে মাওলানা আহমাদ আলীর উচ্চ মর্যাদার কথা সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে দেখা যায়।

মাওলানার কনিষ্ঠপুত্র বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে সম্ভবতঃ ১৯৭৮ সালের দিকে কোন এক প্রয়োজনে আমি বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন সচিব লাবসার সম্ভবতঃ জনাব আব্দুল হক-এর আজিমপুরের সরকারী বাসায় যাই। আমার নাম ও পিতার নাম লিখে ভিতরে একটা স্লিপ পাঠিয়ে দেই। আমাকে বসতে দেওয়া হয়। এমন সময় সচিব ছাহেব বাড়ীতে আসেন ও সোজা ভিতরে গেলে তাঁর হাতে আমার স্লিপ পৌঁছে যায়। তিনি ঐ অবস্থায় এসে আমার সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। পিছে পিছে তাঁর স্ত্রীও এলেন। তারা উভয়ে আব্বার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে কেঁদে ফেললেন। স্ত্রী বললেন, আমি প্রায়ই ওনার মুখে উস্তাদজীর প্রশংসা শুনি। আপনি তাঁর সন্তান। তাই আপনাকে দেখার আবেগ সামলাতে পারলাম না। এ সময় সচিব ছাহেব বললেন, উস্তাদজীর আদর-সোহাগ, বকাঝকা, চলাফেরা সবই আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কোন পড়া বেঁধে গেলে উস্তাদজীর সে কি আকুতি। পড়া না করা পর্যন্ত ছাড়তেন না। মাঝে-মধ্যে ছড়ি দিয়ে হালকা মার দিতেন। ওটা ছিল আমাদের জন্য আশীর্বাদ। বলেই তিনি পিঠে হাত দিয়ে বলেন, আমি এখনও তাঁর মারের স্পর্শ অনুভব করি। যদি তিনি সেদিন আমাদেরকে এভাবে কর্তব্য কর্মে দায়িত্বশীল করে গড়ে না তুলতেন, তাহ'লে আজ এই উঁচু পর্যায়ে আমরা আসতে পারতাম না। জীবনে বহু শিক্ষক দেখেছি। কিন্তু এমন আদর্শ শিক্ষক দেখিনি। তিনি আমার নিকটে ভক্তির সর্বোচ্চ আসনে ভাস্বর হয়ে আছেন। সর্বদা আমি তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করি। এ পর্যায়ে এসে তিনি কেঁদে ফেলেন। আমি হতবাক বিস্ময়ে এই দু'জন প্রবীণ স্বামী-স্ত্রীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিমাপ করলাম এবং মনে মনে বললাম, হায়! আমরা আমাদের পিতাকে সত্যিকার অর্থে চিনতে পারিনি।

তিনি আরও বলেন, ২০০৯ সালের ৮ই মে শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক শহরের প্রাণকেন্দ্র চিলড্রেন্স পার্কে আয়োজিত যেলা সম্মেলনের মঞ্চে বসে সে সময়ের পৌরসভা মেয়র জনাব শেখ আশরাফুল হক (৭৫) আমাকে বলেন, উস্তাদজীর ছেলের সম্মেলন বলেই আমি এসেছি ও সহযোগিতা করেছি। আপনাকে দেখে উস্তাদজীর স্মৃতি ভেসে উঠছে। তিনি বললেন, আমার হাতের লেখা ভাল ছিলনা। বারবার চেষ্টায়ও হয় না। একদিন উস্তাদজী আমাকে বললেন, কাল যদি তোমার লেখা ভাল না হয়, তাহ'লে দু'আঙ্গুলের মাঝখানে উডপেন্সিল দিয়ে চাপ দিয়ে আঙ্গুল ভেঙ্গে দেব। আমি ভয়ে তার পরদিন সুন্দর লেখা নিয়ে আসি। সেই থেকে এখনও আমার হাতের লেখা সুন্দর।

❑ বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি :

১৩১৮ সাল মোতাবেক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৮ বছর বয়সে ফাযেল বা উলা জামা'আতের ছাত্র থাকা অবস্থায় বৃদ্ধ মাতা-পিতার ঐকান্তিক আগ্রহে দেবহাটা উপযেলার ভাতশালা গ্রামের তরফাতুল্লাহ সরদারের কন্যা উম্মে কুলছূমের পাণি গ্রহণ করেন। দুই কন্যা ও দুই পুত্র সন্তান লাভের পর ১৩৩৫ সালের ২৩শে মাঘ প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। এই পক্ষে বর্তমানে (২০১১ ইং) এক পুত্র জীবিত আছেন। পুত্র জনাব আব্দুল্লাহ আল-বাকী ১৯৬২ সাল থেকে পরপর দু'বার এবং ১৯৮৫ সালে তৃতীয়বার আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদের 'চেয়ারম্যান' নির্বাচিত হন এবং শেষোক্ত বারে খুলনা যেলার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যানের 'স্বর্ণপদক' লাভ করেন। তিনি শুরু থেকেই 'সমবায়' আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং ১৯৭৬ সাল থেকে খুলনা যেলা সমবায় ইউনিয়নের পরপর দু'বার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় পুত্র নূরুল্লাহ ছাত্রাবস্থায় কলিকাতার শিয়ালদহ রেলষ্টেশনে নামতে গিয়ে পা ফসকে ট্রেনের নীচে কাটা পড়ে মারা যান।

প্রথমা স্ত্রীর ইন্তেকালের পরে মাওলানা আহমাদ আলী বাংলা ১৩৩৮ সালে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমাধীন ঘোড়ারাস গ্রামের পণ্ডিত বাহার আলী খানের (উস্তাদজী) দ্বিতীয়া কন্যা মুসাম্মাৎ বছীরুন্নেসার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই পক্ষে যমজসহ সর্বমোট ১১টি কন্যা ও ৫টি পুত্র সন্তানের মধ্যে দুই কন্যা ও এক পুত্র বেঁচে আছেন। পুত্র ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ছোট-বড় ৩৮-এর অধিক বইয়ের লেখক। তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও মাসিক 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। বর্তমানে তিনি মাসিক 'আত-তাহরীক' গবেষণা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত।

মাওলানা আহমাদ আলী মৃত্যুকালে বিধবা স্ত্রী, দুই পুত্র, চার কন্যা ও সর্বমোট ২৯ জন নাতি-নাতনী রেখে যান। তাঁর বিধবা স্ত্রী মুসাম্মাৎ বছীরুন্নেসা বিগত ২৬শে জুন ১৯৮৪ মোতাবেক ২৫শে রামাযান ১৪০৪ হিজরী, ১১ই আষাঢ় ১৩৯১ মঙ্গলবার সকাল ৯-২০ মিনিটে দুরারোগ্য 'পার্কিনসন্স' (Parkinsons) রোগে প্রায় আড়াই বৎসর শয্যাশায়ী থাকার পর ৭৪ বৎসর বয়সে স্বগৃহে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*।

স্ত্রী বছীরুন্নেসা তার পিতার কাছ থেকেই উর্দু, বাংলা শিখে এসেছিলেন। তিনি বাড়ীতে নিয়মিত উর্দু তাফসীর 'মুযেহুল কুরআন' পড়তেন। বাড়ীর বৌ ও মেয়েদের পয়ার ছন্দে 'খায়রুল হাশর' ও 'মুনীরুল হুদা' পড়ে শোনাতেন। বাড়ীতে নিয়মিত মেয়েদের পড়াতেন। বুলারাটি, তালবেড়ে, মাহমূদপুরের বহু মেয়ে ও বৌরা তাঁর নিয়মিত ছাত্রী ছিল। আমৃত্যু তিনি এ খিদমত করে গেছেন নিঃস্বার্থ ভাবে। তিনি কঠিন পর্দানশীন ছিলেন। তাঁর দো'আ ও পানি পড়ার সুনাম ছিল সর্বত্র। ছোট ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছুটিতে বাড়ী এসেছে। কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে মা বলছেন, খোকা! প্রায় দু'সপ্তাহ আগে মঙ্গলবারে তোমার খুব জ্বর হয়েছিল, তাই-না? ছেলে হতবাক। দিনক্ষণ ঠিক করে কিভাবে বললেন? ঢাকায় ফিরে রুমমেট বামপন্থী ছাত্রটিকে মা ও সন্তানের মধ্যকার অদৃশ্য বন্ধনের এই অলৌকিক ঘটনা শুনালে তার বস্তুবাদী দর্শনে এর কোন জবাব নেই বলে স্বীকার করে। প্রতিদিন সকালে বিশেষ করে বর্ষাকালে শিউলী ফুলের পাতা, আনারসের পাতার মাজ, চটি-মকরধ্বজ বেটে রেখে দিতেন। পাড়ার কোন বাচ্চা এলে মধু খাওয়ার লোভ দেখিয়ে কাছে ডেকে এনে জিভে মধু মাখিয়ে দিয়ে ঐ প্রচণ্ড তিতা রস ছোট্ট কাপে করে বাচ্চার নাক টিপে ধরে তার গালে ঢেলে দিতেন। এতে শিশুদের কৃমি দূর হ'ত।

❑ চরিত্র :

মাওলানা আহমাদ আলীর চরিত্রে একই সঙ্গে সমাবেশ ঘটেছিল লেখনী, বাগ্মিতা, নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক প্রতিভার দুর্লভ গুণসমূহ। সেই সঙ্গে তাঁর কতগুলি মানবিক গুণ ছিল অতীব মূল্যবান- যা সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করতো। তিনি ছিলেন মৃদু ও মিষ্টভাষী, সদালাপী ও অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। ভিতরে-বাহিরে সহজ-সরল ও নির্ভেজাল সৎ। তিনি ছিলেন গভীর ধৈর্যশীল ও কঠিন নিয়মানুবর্তী। হালাল রোযগারের প্রতি ছিল তাঁর কঠোর ও সুক্ষ্ম দৃষ্টি। নিজের আক্বীদা ও আমলে অবিচল থেকে প্রতিকূল পরিবেশে সবার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার এক অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর। কারু অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া ছিল তাঁর চিরকালের স্বভাব বিরুদ্ধ।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব আব্দুল্লাহ আল-বাকী (৮৮) বলেন, আব্বা কখনো কারু মুখাপেক্ষী হতেন না। তাঁর জীবনটাই ছিল সংগ্রাম মুখর। কিন্তু তাঁর চরিত্রের

সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি সর্বদা নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকতেন। তাঁকে কেউ দমাতে পারেনি'।[৬]

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট মনোনীত সাতক্ষীরা-কলারোয়ার নির্বাচিত এম. এল. এ. জনাব মোমতায আহমাদ (৯২) বলেন, মাওলানা আহমাদ আলী ছিলেন বৈষয়িক, সরল, মিষ্টভাষী, নরম মেযাজের ও সকলের হৃদয়ের মানুষ। রাস্তা দিয়ে যখন সাইকেলে যেতেন, তখন সকলে সমস্বরে বলত, ঐ যে উস্তাদজী যাচ্ছেন। তিনি ছিলেন আমাদের মাথার মুকুট। তিনি ছিলেন একটি মাইলফলক, একটি ইতিহাস'।

কাকডাঙ্গা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকালীন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, মাওলানা আহমাদ আলী মাদরাসা করবেন। কিন্তু ঝাউডাঙ্গায় করবেন, না কাকডাঙ্গায় করবেন, এ নিয়ে কাকডাঙ্গায় মুন্সী যয়েনুদ্দীন স্কুল প্রাঙ্গণে মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে বড় একটা সভা ডাকা হয়। সেখানে আমার দীর্ঘ বক্তৃতার পর চারদিক থেকে ধ্বনি ওঠে, 'কাকডাঙ্গা মাদরাসা যিন্দাবাদ'। পরের দিন কাকডাঙ্গা মসজিদে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হ'ল যে, মাদরাসার নাম হবে 'কাকডাঙ্গা আহমাদিয়া মাদরাসা'। এটাই হ'ল কাকডাঙ্গা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার গোড়ার ইতিহাস। এর মূলে দু'টি কারণ ছিল : (১) ঝাউডাঙ্গায় হানাফী সংখ্যা বেশী। আহলেহাদীছ ছেলেরা লজিং পেতনা (২) জমঈয়ত থেকে পৃথক বুঝানো'। কে পরে এই নাম পাল্টালো, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি ইঙ্গিতে বলেন, কিছু শয়তান'।[৭] এজন্যেই কথায় বলে, 'পকেটের চাকুতে পেট কাটে'।

কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, সবাই 'ফকীরী বিদ্যা' বলত বলে আমি মাদরাসায় পড়তে চেতাম না। কিন্তু আব্বার ভয়ে কিছু বলতাম না। একদিন বাড়ীতে বারান্দায় বসে ভাত খাওয়ার সময় সাহস করে ভাই আব্বাকে বললেন, আব্বা! আমাদের বংশে কোন 'ডাক্তার' নেই। খোকার মাথা ভাল। ওকে মাদরাসায় না পড়িয়ে ডাক্তারী পড়ালে কেমন হয়? কিছুক্ষণ চুপ থেকে আব্বা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আব্দুল্লাহ! তোমার ছেলেকে তুমি ডাক্তার বানাও, আমার ছেলেকে আমি ফকীর বানাবো'। এর মধ্যে দ্বীনী শিক্ষার প্রতি তাঁর দৃঢ়চিত্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরেকদিনের ঘটনা। তখন সবেমাত্র 'কেরোলিন' কাপড় বেরিয়েছে। সৌখিন কাপড় হিসাবে তখন বাজারে খুব কদর। মা ও বোন জামীলা মিলে আমাকে একটা কেরোলিনের পাঞ্জাবী বানিয়ে দিয়েছেন। আব্বাকে লুকিয়ে গায়ে দেই।

---

৬. সাক্ষাৎকার ২৫/১২/২০১১ ইং।
৭. সাক্ষাৎকার ২০/১২/২০১১ ইং।

কিন্তু একদিন আব্বার নযরে পড়ে যাই। আব্বা আমাকে কিছু না বলে মাকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ছেলেকে কেরোলিনের জামা আমি কিনে দিতে পারতাম না? এখুনি দামী জামা গায়ে দিলে পরে কি আর কম দামী জামা গায়ে দিতে পারবে? একথার মধ্যে সন্তান গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টি ফুটে ওঠে। তখন আমি আলীপুর ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে ক্লাস থ্রি-র ছাত্র। এরপর থেকে আমি আর কোনদিন সূতী জামা ব্যতীত কেরোলিন জামা গায়ে দেয়নি। বলা বাহুল্য, আমার স্কুল জীবনের লেখাপড়া ঐ থ্রি পর্যন্তই। এরপর থেকে মাদরাসা।

মাওলানা আহমাদ আলী কেমন শিক্ষক ও সময়ানুবর্তী ছিলেন নিম্নের ঘটনাতে সেটা বুঝা যায়। শনিবার ভোরে তিনি বের হবেন বুলারাটি থেকে কাকডাঙ্গা মাদরাসা অভিমুখে। কাঁচা ও ভগ্ন রাস্তা সাতক্ষীরা-মাধবকাটি হয়ে কাকডাঙ্গা প্রায় ১৭ মাইল। সাইকেলের পিছনে ও সামনে কনিষ্ঠ পুত্র ও নাতি ছদরুল আনাম। কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষীর ও রসের পিঠার ভক্ত। মা ও বোন জামীলা দু'জন দু'টি থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাচ্চাদের খাওয়াবেন। কিন্তু না। সময়মত ১ম পিরিয়ড ধরতে পারবেন না বিধায় চলে গেলেন। দুই মা ও দুই সন্তান অপলক নেত্রে এই করুণ দৃশ্য দেখল'।

বুলারাটি থেকে কাকডাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তায় যতটি গ্রাম, শহর ও বাজার পড়তো, সবগুলির হিসাব নিতেন ক্ষুদে প্যাসেঞ্জারদ্বয়ের কাছ থেকে। মাঝে-মধ্যে এগুলি বাক্যাকারে শুদ্ধ বাংলায় ও আরবীতে জিজ্ঞেস করতেন। না পারলে বলে দিতেন। বাজারে গেলে ছাত্রদের খোসাওয়ালা খাদ্য যেমন পাকা কলা, বাদাম ইত্যাদি খেতে বলতেন। কিন্তু সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি আলগা খাবারে নিষেধ করতেন। কোন ছাত্রকে বাজারে টুপীবিহীন দেখলে পরদিন ক্লাসে সাবধান করতেন। তিনি ছাত্রদের কাগজ মাড়াতে নিষেধ করতেন ও বলতেন, দেখ! কাগজেই তোমার বিদ্যা। ওটা পায়ে দাবাতে নেই। বাজারের ঠোঙা বা লেখা কোন কাগজ পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে তিনি পড়তে বলতেন। কেননা সেখানেও কোন জ্ঞানের কথা লেখা থাকতে পারে। তিনি অপচয়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ওযূর পানিতে বা অন্য কিছুতে কোনরূপ অপচয় তিনি বরদাশত করতেন না। কোন বস্তু তিনি ফেলে দিতে চাইতেন না। ছাত্রদের তিনি শিখাতেন, 'জিনিষ আমারে চিনিস।' তিনি ছাত্রদের কাছে কেমন প্রিয় ছিলেন যে, যখনই কোথাও থেকে সাইকেলে এসে মাদরাসার সামনে নামতেন, অমনি সব ক্লাস থেকে ছাত্ররা দৌড়ে চলে আসত সাইকেলটা কে আগে ধরবে ও যথাস্থানে রাখবে, সেজন্য। কেউ সাইকেল মোছার কাজে, কেউ তাঁকে পানির বদনা এনে দেবার কাজে, কেউবা পায়ের কাদা ধোয়া ও জুতা ছাফ করার কাজে লেগে যেত। এজন্য কাউকে ডাকার প্রয়োজন হ'ত না।

কনিষ্ঠ পুত্র বলেন, আব্বাকে কখনো ক্লাসে কোন ছাত্রকে মারতে দেখিনি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বকে ছাত্ররা সর্বদা সমীহ করত। তিনি চেয়ারে কম বসতেন। প্রায়ই ক্লাসে হেঁটে হেঁটে পড়া ধরতেন ও মুখস্ত করাতেন। তিনি সর্বদা নিত্য ব্যবহার্য কথাগুলির আরবী বলে দিতেন ও তা মুখস্ত শুনতেন। আরবী ব্যাকরণ এমনভাবে পড়াতেন যে, তা খুবই সহজ মনে হ'ত। একবার তিনি যশোরে যাবেন শুনে আমার জন্য একটা দু'ব্যাটারী লাইট আনতে বললাম। জবাবে আব্বা বললেন, ঐ কথাটি আরবীতে বাক্যাকারে লিখে দাও। কিন্তু টর্চ লাইটের আরবী আমি জানিনা। কিন্তু লিখতে না পারলে লাইট পাবো না। আবার কাউকে জিজ্ঞেস করাও নিষেধ। ফলে দিন-রাত খেটে কোন রকমে আরবীতে বাক্য বানিয়ে পরদিন সকালে আব্বাকে দিলাম। আব্বা খুশী হয়ে আমাকে 'এভারেডী' (EVERADY) লাইট কিনে এনে দিলেন। তখনকার সময় ওটা ছিল খুবই আকর্ষণীয় পুরস্কার। 'আলেম' পরীক্ষার আগে আব্বা আমাকে বললেন, 'খোকা! মাত্র ৩ নম্বরের জন্য আমি আলেমে স্কলারশিপ পাইনি। তুমি যদি সেটা পাও, তাহ'লে আমি সবচেয়ে খুশী হব'। আল্লাহ্র রহমতে তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল। হাঁ, এবারে আব্বা কিনে দিলেন 'কেমি' (CAMY) ঘড়ি। তখন (CAMY) ও (CAVALRY) ছিল বাজারের সেরা ঘড়ি।

তিনি বলেন, আব্বার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যদের থেকে ব্যতিক্রমী। যখন শিক্ষকরা উর্দূ 'মীযান' ও ফার্সী 'নাহুমীর' পড়াতে অভ্যস্ত, তখন তিনি শিক্ষকদের ওগুলি বাংলায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে পড়াতে বলতেন এবং পরীক্ষার খাতায় উর্দূ অথবা বাংলায় উত্তর লেখার নির্দেশ দিতেন। তিনি সবাইকে বলতেন, আমার ছেলে যখন মাতৃভাষা বাংলাই ভাল করে শিখেনি, তখন সে কিভাবে একটি বিদেশী ভাষা আরবী অন্য একটি বিদেশী ভাষা উর্দূ বা ফার্সীর মাধ্যমে শিখবে?

কৈশোরে ও যৌবনে তিনি যেমন ছিলেন খেলায় ও মাছ ধরায় পটু, তেমনি ছিলেন পাখি শিকারে উস্তাদ। বাড়ীতে ছিল পাঁচটি বন্দুক। নিজ হাতে বন্দুক ও গুলি তৈরী করতেন তিনি। পাখি শিকারে তাঁর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। মাছ শিকারে ছিল দারুণ ঝোঁক। কয়েক রকমের জালই ছিল তার নিজ হাতের তৈরী। জাল বোনা, মাদুর বোনা ছাড়াও চাষাবাদের সবরকম কাজে তাঁর হাত ছিল পাকা। উচ্চলম্ফ, দীর্ঘ লম্ফ, বংশ লম্ফ ও লম্বা দৌড়ে কেউ তাঁর সাথে এঁটে উঠতে পারতো না। তিনি স্বীয় নাক বরাবর উর্ধলম্ফ এবং ১৮ হাত দীর্ঘ লম্ফে অভ্যস্ত ছিলেন।

তাঁর কতগুলি অভ্যাস ছিল সারা জীবনের। যেমন- ভোরে উঠে খালিপেটে বাসি চাউল-পানি। ফজরের ছালাতের পর খালি পায়ে অথবা জুতা পায়ে দৌড়ানো। লাবসায় থাকাকালে ফজর পর লাবসা হ'তে মাধবকাটি পর্যন্ত তিন তিন ছয় মাইল রাস্তা দৌড়াতেন। বৃদ্ধ বয়সে মসজিদের বারান্দায় হ'লেও দৌড়ানোর অভ্যাস

বজায় রেখেছিলেন। তিনি বাসি পানি ব্যতীত টাটকা টিউবওয়েলের পানি কখনো পান করতেন না। দুধ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হ'লেও গোশতের পরে কখনোই দুধ খেতেন না। পায়খানার পরে খাওয়া এবং খাওয়ার পরে পেশাব করা ছিল তাঁর অন্যতম অভ্যাস। দুপুরে খাওয়ার পরে সামান্য গড়াগড়ি ও রাতে খাওয়ার পরে দীর্ঘক্ষণ হাঁটা তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল। খাওয়ার মধ্যে পানি পান করতেন না। সকালে-বিকালে হাল্কা নাশতা করতেন। সর্বদা অল্প কিন্তু উত্তম খাবার খেতেন। তিনি বলতেন, 'মানুষ খেয়ে মরে, না খেয়ে মরে না'।

যত রাতেই তিনি শোন না কেন, তাহাজ্জুদের ছালাত ক্বাযা হ'ত না। যখন জিন-ভূতের ভয়ে কেউ ফজরের জামা'আতে মসজিদে আসত না, তখন তিনি কাকডাঙ্গা মসজিদে দীর্ঘ ক্বিরাআতে ফজর পড়তেন। মাঝে-মধ্যে কান্নায় ক্বিরাআত বন্ধ হয়ে যেত। একবার বুলারাটি মসজিদের ঘড়ি চুরি হয়ে গেলে জুম'আর খুৎবায় তিনি এক সপ্তাহ সময় দিলেন। তাঁর বদ দো'আর ভয়ে চোর দু'দিনের মধ্যেই ঘড়ি যথাস্থানে রেখে গেল। তিনি ছিলেন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। লম্বায় চওড়ায় মধ্যম গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের এই মানুষটির চরম বার্ধক্যেও গাত্রচর্ম ঢিলা হয়নি। মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে সকল দাঁত হারালেও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর মাথার বাবরী চুলগুলো ছিল কালো কুচকুচে। লম্বা সিঁথির মাঝ বরাবর অল্প কিছু চুলে পাক ধরেছিল। দাড়ি ছিল কাঁচা-পাকা। মাথার তালুতে সামান্য নারিকেলের তৈল অথবা লক্ষীবিলাস তৈল ব্যতীত সমস্ত চুলে কখনোই তৈল মাখতেন না। গায়ে সাবান দিতেন না। অথচ কখনোই গা গন্ধ হ'ত না। বরং গেঞ্জি সুঘ্রাণ লাগতো। শীতকালে কাঁচা রোদে বসে দেহে খাঁটি সরিষার তৈল মর্দন পসন্দ করতেন। কখনো খালি গায়ে চলতেন না। ভাল গামছা ও গেঞ্জি পরতেন। সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকতেন। কিন্তু কোনরূপ পোষাকী বিলাসিতা তাঁর ছিল না। মেটো রংয়ের মোটা সূতী কাপড়ের মধ্যম ঝুলের পাঞ্জাবী পরতেন। যৌবনে 'ছাদরিয়া' ও পীত বর্ণের পাগড়ীতে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে বৃদ্ধ বয়সে কেবল টুপী পরতেন। বড় তালি দেওয়া জামা পরেও যেকোন মজলিসে স্বাচ্ছন্দ্যে যোগদান করতেন। একবার গরালী সফরে গিয়ে নদীতে ভাটা থাকায় ছাত্র আব্দুছ ছামাদ তাঁকে আড়কোলা করে নৌকায় তোলে। ওপারে গিয়ে লোকেরা পোষাকের বাহার দেখে ছাত্রকেই প্রধান অতিথি ভেবে সম্মান দেখাতে থাকে। তিনি বলতেন, আমার এলাকায় আমিই প্রথম সাইকেল কিনি। যেদিন আমি কলিকাতা থেকে 'হাম্বার' (HUMBER) সাইকেল ও 'ওমেগা' (OMEGA) পকেট ঘড়ি নিয়ে বাড়ী আসি, সেদিন তা দেখার জন্য মাহমূদপুর হাটখোলায় মানুষের ঢল নামে। কিভাবে দু'চাকার সাইকেলে মানুষ বসে থাকতে পারে, অথচ হেলে পড়ে যায় না,

এটাই ছিল সকলের প্রশ্ন। পকেটের ঘড়িতে কিভাবে সূর্য্যের টাইম জানা যায়, এগুলো বুঝাতেই আমি গলদঘর্ম হয়ে যেতাম।

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে (১৯৭৫ খৃঃ) সাতক্ষীরায় ইসলামী সেমিনার উপলক্ষে আগত দেশের সেরা ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে সাতক্ষীরা সরকারী আই.বি. রেষ্ট হাউসে গামছায় বাঁধা কাপড়ের পোটলা বগলদাবা করে পিঠের দিকে প্রায় পৌনে একহাত লম্বা তালি দেওয়া জামা গায়ে উপস্থিত হলে কনিষ্ঠ পুত্রের প্রশ্নের জওয়াবে হাসিমুখে বলেছিলেন- 'বাবা! চেনা বামনের পৈতা লাগে না'। এক বৎসর পরে তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান কেঁদে ফেলেছিলেন এবং ঐদিনের উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে ক্লাস বন্ধ করে তাঁর স্মৃতিতে বক্তৃতার এক স্থানে ছাত্রদের সামনে বলেছিলেন, 'এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলেম কখনো দেখিনি। সাতক্ষীরায় না গেলে এমন মানুষটি সম্পর্কে আমি কখনোই জানতে পারতাম না'।

মৃত্যুর এক বছর আগে রামাযান মাসে বুলারাটি থেকে প্রায় ১৯ মাইল সাইকেল চালিয়ে ব্রজবাকসায় পৌঁছেন ইফতারের সামান্য পূর্বে। গরমের দিন। ঐ সময় আগে থেকে সেখানে উপস্থিত কনিষ্ঠ পুত্র দৌড়ে হাতপাখা এনে বাতাস করতে থাকলে তিনি হাসতে হাসতে মানা করে বলেন, এতটুকুর জন্য বাতাস খেতে হবে?' তিনি যে কেমন কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, তা এতে বুঝা যায়।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। মেহমান ছাড়া খেতে তিনি অস্বস্তিবোধ করতেন। ছাত্রদেরকে তিনি সন্তানবৎ স্নেহ করতেন। নিজে বক্তৃতা লিখে মুখস্থ করিয়ে মসজিদে দাঁড় করিয়ে ছাত্রদের বক্তৃতা শুনতেন। তারপর বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাদের বক্তৃতা করাতেন। বক্তৃতা ভাল হৌক বা না হৌক সর্বদা পিঠ থাবড়ে 'মারহাবা' বলে উৎসাহ দিতেন। তাদেরকে সর্বদা প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও অভিনন্দনপত্র লেখায় উদ্বুদ্ধ করতেন। এভাবে সমাজের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত গঠনমূলক ও সুদূরপ্রসারী। তিনি নিজে বাংলায় ও উর্দূতে কবিতা লিখতে পারতেন। বাংলা পদ্য ছন্দে তাঁর দু'টি পুস্তিকাও রয়েছে। উর্দূ কবিতায় অভিনন্দনপত্র রচনা করে তিনি ছাত্রদের দিয়ে কখনো কখনো সম্মানিত মেহমানদের শুনাতেন। যেমন ঝাউডাঙ্গার এক ইসলামী জালসায় জনৈক আহলেহাদীছ নেতার আগমনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর লেখা উর্দূ অভিনন্দন মূলক কবিতা তাঁর প্রিয় ছাত্র আব্দুর রহমান (কাকডাঙ্গা) শুনিয়েছিল। যার প্রথম লাইন ছিল '*আফযালুল ফুযালা তুঈ হ্যায় নায়েবে খায়রিল ওয়ারা...*'। তিনি সর্বদা ছাত্র পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে

ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, 'যেখানে আমার ছাত্র নেই, সেখানে যেন আল্লাহ আমাকে না নিয়ে যান'।

ছাত্রাবস্থায় ছেলেদের বিয়ে দেবার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। সে যুগে বাল্য বিবাহ রীতি সিদ্ধ ছিল। বিশেষ করে ভালো ছেলেদের ছাত্রজীবন থেকেই মেয়ের বাবারা পিছু নিতেন। মাওলানার কনিষ্ঠ পুত্র 'আলেম' বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় সারা দেশে ১৬ তম স্থান অধিকার করলে চারদিক থেকে বিয়ের পয়গাম আসতে থাকে। মাওলানা সে সময় শুভাকাংখীদের বলতেন, 'ও আমার রেসের ঘোড়া! ওর পায়ে দড়ি বেঁধনা'। কনিষ্ঠ পুত্রকে তিনি সর্বদা নিজের কাছেই মসজিদে রাখতেন। ছোট থেকে তাকে বাংলা মাসিক 'মোহাম্মাদী'র গ্রাহক করে দেন। পরবর্তীতে লাহোরের সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকার গ্রাহক করে দেন উর্দূ ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য। এই সময় বাংলা 'মার্কিন বার্তা' ফ্রি আসত। সেটাও নিয়মিত ছেলেকে পড়তে দিতেন। তাকে লেখার জন্য সর্বদা উৎসাহ দিতেন। মাদরাসায় আসা মেহমানদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পত্র ও বিদায়ী ছাত্রদের পক্ষে 'বিদায় বাণী' লেখার দায়িত্ব প্রায়ই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের উপরেই পড়ত। তিনি সেই লেখা নিয়ে সবাইকে পড়াতেন ও ছেলেকে উৎসাহ দিতেন। 'বিদ্যা অমূল্য ধন' শিরোনামে এক পৃষ্ঠার একটি বক্তৃতা লিখে দিয়ে তিনি ছেলেকে তা মুখস্ত করতে বলেন। পরে ইটেগাছার জালসায় সভাপতি হিসাবে তাঁর নির্দেশে ভয়ে ভয়ে সেটা পাঠ করে মঞ্চ থেকে পালিয়ে যান। বলা বাহুল্য, এটাই ছিল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের সর্বপ্রথম জনসভায় বক্তৃতার সূচনা। ভাষা শেখার জন্য কনিষ্ঠ পুত্রকে সর্বদা গ্রামার ও ডিকশনারি চর্চা করতে বলতেন। সেভাবে ইংরেজী, বাংলা ও আরবী ভাষায় তিনি ছোটবেলাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিন ভাষায় তিন বন্ধুর কাছে তিনি নিয়মিত পত্র লিখতেন। বাংলায় যশোরের এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান (অধ্যাপক, দৌলতপুর বি এল কলেজ), ইংরেজীতে যশোরের বদরুদ্দোজা (অধ্যাপক, কেশবপুর ডিগ্রী কলেজ) ও আরবীতে আগরদাঁড়ীর আব্দুল খালেক মণ্ডল (অধ্যক্ষ, আগরদাঁড়ী কামেল মাদরাসা)। এর মাধ্যমে রীতিমত ভাষার প্রতিযোগিতা হ'ত। ছেলে আরবী কবিতায় পত্র লিখতেন। আব্দুল খালেক মণ্ডল গদ্যে জবাব দিতেন। কবিতায় জবাব দিতে পারতেন না। মাওলানা সব পত্র পড়তেন ও ছেলেকে উৎসাহ দিতেন। কাকডাঙ্গা মাদরাসা থেকে বিদায়ের সময় ছেলে আরবী কবিতায় দীর্ঘ 'বিদায় বাণী' লিখে ও পাঠ করে শুনালে ছাত্র ও শিক্ষকগণ খুশীতে প্রাণভরে দো'আ করেন। এভাবে তিনি পাথরঘাটা মসজিদে প্রায় এক বছর ও কাকডাঙ্গা মসজিদে দশ বছর কাছে রেখে ছেলেকে ছোট থেকে গড়ে তোলেন।

বাচ্চাদের প্রতি তাঁর স্নেহদৃষ্টি ছিল অপরিমেয়। যখনি বাড়ী ফিরতেন পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে ভিড় জমাতো বিস্কুট বা লজেন্স খাওয়ার জন্য। লজেন্স বলতে তখন 'গুলি মেঠাই' বুঝাতো। গর্ভবতী মায়েদের প্রতি ছিল তাঁর অত্যন্ত সংবেদনশীল অনুভূতি। নিকটাত্মীয়াদের মধ্যে কেউ অন্তঃসত্ত্বা জানতে পারলে নিজে গিয়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক করে সন্দেশ বা রসগোল্লা খাইয়ে আসা তাঁর একটি নিয়মিত অভ্যাস ছিল। কোন ভিক্ষুক বা সায়েলকে তিনি কখনোই খালি হাতে ফিরাতেন না। বাড়ীতে ভিক্ষুক এলে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'তোমরা জানের ছাদাক্বা দাও'।

অর্থ সঞ্চয় করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপরে তাওয়াক্কুল ছিল তাঁর চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক তাঁকে কখনো অভাব-অনটনে কষ্ট দেননি। তবে '৭১-য়ে রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনজনিত কারণে তাঁকে কয়েকমাস কষ্টে কাটাতে হয়েছিল, যা তিনি গভীর ধৈর্যের সঙ্গে মুকাবিলা করেছিলেন। জীবনে কোন সঞ্চয় তাঁর ছিল না। এমনকি মৃত্যুর পরে তাঁর কাফনের কাপড় কিনতে হয় কনিষ্ঠ পুত্রের স্কলারশিপের টাকা দিয়ে।

তিনি যেন ছিলেন অজাতশত্রু। হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে দেখলে সম্মানে নুইয়ে পড়তো। তাঁর ঝাড়-ফুঁকে আল্লাহ পাক বরকত দান করেছিলেন, যাতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হ'ত। একদা তিনি বোয়ালিয়া গ্রামের মধ্য দিয়ে সাইকেল চড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন যে, আগুনের লেলিহান শিখা একটি পাড়াকে গ্রাস করে ফেলেছে। লোকেরা আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ওঝার আশ্রয় নিয়েছে। কালবিলম্ব না করে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে শিরকী কালামে অভ্যস্ত ওঝাগুলোকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন। অতঃপর কালামে পাক থেকে কিছু আয়াত পড়ে ফুঁক দিয়ে এক কলসী পানি 'বিসমিল্লাহ' বলে একটি ঘরের উপরে ছিটিয়ে দিলেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সমস্ত আগুন একই সঙ্গে নিভে গেল। এ ধরনের অনেক ঘটনা অনেকের মুখে প্রায়ই শুনা যায়।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ আল-বাকী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। শরীরে স্যালাইন টানা বন্ধ হয়ে গেছে। ডাক্তার নিরাশ হয়ে গেছেন। আসন্ন মৃত্যুর আশংকায় কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এমন সময় পিতা মাওলানা আহমাদ আলীকে ১৭ মাইল দূরের কর্মস্থল কাকডাঙ্গা থেকে ছাত্র আব্দুর রহমান তাঁকে সাইকেলের পিছনে করে নিয়ে এল। তিনি এসে পুত্রের মুখ দর্শন না করে সোজা মসজিদে গিয়ে সিজদায় পড়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র কি অপার অনুগ্রহ! কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু পথযাত্রী পুত্রের অসাড় দেহে যেন নব জীবনের সঞ্চার

হ'ল। মসজিদে সংবাদ গেল। তিনি উঠে পুনরায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে এসে পুত্রের উজ্জ্বল মুখ দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

পীরপূজার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী মাওলানা আহমাদ আলী নিজের অজান্তেই মানুষের হৃদয়ের গভীরে আসন করে নিয়েছিলেন। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (১৯০০-১৯৬০ খৃঃ) তাঁকে লেখা চিঠিতে 'হযরত শাহ ছূফী মাওলানা আহমাদ আলী শ্রদ্ধাষ্পদেষু' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি যেখানেই বসতেন পানি পড়া ও মাথায় ফুঁক দেওয়ার হিড়িক পড়ে যেত। তাঁর নববিবাহিতা দ্বিতীয়া স্ত্রী ঘরে এলে কোন এক ভক্ত স্বপ্নে দেখেন যে, হুযুরের স্ত্রীর পানি পড়া খেলে তার রোগ সেরে যাবে। অনভ্যস্ত স্ত্রী বাধ্য হয়ে তাকে পানি পড়ে দেন। তাতে লোকটি কঠিন অসুখ থেকে মুক্তি পায়। অতঃপর লোকটি গরুর গাড়ী ভরে জমির ফসল ও অন্যান্য উপঢৌকনাদি নিয়ে চলে আসে। এভাবে শুরু হ'ল চারদিক থেকে হাদিয়া-তোহফা আসার প্রতিযোগিতা। বারবার নিষেধ করেও কাজ হয় না। অবশেষে মাওলানা সবাইকে জানিয়ে দিলেন, যদি এগুলি বন্ধ না করা হয়, তাহ'লে তিনি বা তাঁর স্ত্রী আর কাউকে পানি পড়া বা ফুঁক দেবেন না। ফলে এই সিলসিলা বন্ধ হয়। *আলহামদুলিল্লাহ* উভয়ে আমৃত্যু এভাবে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করে গেছেন এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র উপরে দৃঢ়ভাবে ভরসা করার উপদেশ দিয়েছেন। মাওলানার মৃত্যুর পর অনেক হানাফী ভক্ত-অনুরাগী আলেম দাবী করেছিলেন যে, মাওলানাকে সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ মহাসড়কের পার্শ্বে তাঁর নিজস্ব জমিতে সমাহিত করা হউক। যাতে লোকদের যেয়ারত করা সহজ হয়। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র ছাফ জওয়াব দিয়েছিলেন যে, এর ফলে ঐ কবর একদিন পূজার স্থানে পরিণত হবে। যার বিরুদ্ধে আব্বা সারা জীবন লড়াই করেছেন। ফলে অনেকে রাযী হলেও অবশেষে তা আর সম্ভব হয়নি।

মৃত্যুর ১৮ দিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাতক্ষীরায় ছোট মেয়ে হালীমার বাসায় ছিলেন সেবা ও চিকিৎসা সুবিধার জন্য। সেখানে তাঁকে দেখার জন্য দৈনিক বহু লোক আসতো দূর-দূরান্ত হ'তে। একদিন সাতক্ষীরার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট সিরাজুল হক তাবলীগ জামা'আতে আগত জনৈক সঊদী মেহমানকে নিয়ে তাঁর নিকটে আনেন। তিন পাশে বালিশে ঠেস দিয়ে মাওলানাকে বসিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি স্বচ্ছন্দে আরবীতে আলাপ শুরু করলে উক্ত সঊদী মেহমান বিস্মিত হয়ে যা মন্তব্য করেছিলেন তার অর্থ দাঁড়ায় 'এই বৃদ্ধ বয়সে কঠিন রোগশয্যায় এমন

একজন গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন আলেমের সাক্ষাৎ ও দো'আ লাভ করে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি'।

মৃত্যুর ৩৫ দিন পূর্বে সাতক্ষীরায় ইসলামী সেমিনারে আগত সম্মানিত অতিথি অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী (রা:বি:), অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান (ঢা:বি:), বিচারপতি এ,কে,এম, বাকের (ঢাকা), মাওলানা এ,কে,এম, ইউসুফ (খুলনা) সকলে একত্রে একদিন সকালে মাওলানাকে দেখতে এলেন। নীচু কুঁড়েঘরে গোলপাতার চালের নীচে বারান্দায় শয্যাশায়ী মাওলানাকে হঠাৎ এভাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বরেণ্য মনীষীবৃন্দ দেখতে আসবেন, কেউ কল্পনাও করেনি। অতিথিবৃন্দের সঙ্গে স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় অর্ধ শতাধিক মানুষের সমাগমে ক্ষুদ্র আঙিনা মুখর হয়ে ওঠে। মেহমানগণ মাওলানাকে ঘিরে বসে তাঁর নিকট দো'আ চাইলেন। মাওলানা সবার জন্য দো'আ করলেন। তার আগে অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান ও অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী নিজ নিজ হাতে তরমুজ উঠিয়ে মাওলানাকে খাওয়ান। বিদায়ের সময় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাস্টিস বাকের মন্তব্য করলেন, 'কুঁড়েঘরের নীচে এমন রত্ন লুকিয়ে আছে আগে তো জানতাম না!'

যেকোন বিপদকে হাসিমুখে মুকাবিলা করার অন্যতম দুর্লভ গুণ ছিল তাঁর চরিত্রে। জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর নিকট হ'তে এর যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে। মৃত্যুর প্রায় দু'মাস পূর্বেও এর নমুনা পাওয়া যায়। একদিন সকালে ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে বললেন, 'আমার মন যেন বলছে আমি এ যাত্রায় বাঁচব না। আমি মরে গেলে তোমাদের হয়ত দুঃখ থাকবে যে, আব্বাকে এলোপ্যাথি চিকিৎসা করালে বোধ হয় বাঁচানো যেত। তোমরা এক্ষণে আমাকে এলোপ্যাথি করাতে পারো। তবে দেখ, জাতবৈদ্য এনো কিন্তু। বলা বাহুল্য, সাতক্ষীরার সেরা এলোপ্যাথদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়েও কোন ফলোদয় হয়নি। অবশেষে আবার তাঁকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাতে হয় সাতক্ষীরার 'খোকা' ডাক্তারের কাছে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজ হাতে বিনা চশমায় রোগ বিবরণী লিখে ডাক্তারের নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি এত ছোট লিখতেন যে, একটি পোষ্টকার্ডে ৬৫ লাইন লেখার রেকর্ড তাঁর আছে। তবে লেখা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, যা পড়তে কারু বেগ পেতে হ'ত না।

নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সদা সজাগ থাকতেন তিনি। এমনকি মৃত্যুকালেও তিনি এর স্পষ্ট নযীর রেখে গিয়েছেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব পর্যন্ত তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে আলাপ করেছেন।

❑ মৃত্যুর ঘটনা :

মৃত্যুর ১৮ দিন পূর্বে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে সাতক্ষীরা হ'তে তাঁকে বুলারাটি গ্রামের বাড়ীতে আনা হয়। ইন্তেকালের দু'দিন আগে থেকে তিনি খানাপিনা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন। অধিকাংশ সময় ঘুমিয়েই কাটাতেন। হঠাৎ ইন্তেকালের দিন সকাল ৯-টার দিকে চোখ মেলে বললেন, 'আমার আজকে মৃত্যু হবে, সবাইকে খবর দাও'। ভাইপো মৌলবী আব্দুর রশীদ নূরী যিনি ঐসময় সাতক্ষীরা যাওয়ার অনুমতি নেওয়ার জন্য শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন, তাকে লক্ষ্য করে সহজভাবে বলে দিলেন, 'খোকা (কনিষ্ঠ পুত্র) বাড়ীতে নেই। তুমি সাতক্ষীরা গেলে আমার জানাযা পড়বে কে?' বলেই আবার চক্ষু মুদলেন।

বিদ্যুৎবেগে খবর ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। আত্মীয়-স্বজন সবাই চলে এলো। বাড়ী লোকে লোকারণ্য। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র আসাদুল্লাহ আল-গালিব তখনও বাড়ী থেকে ১৯ মাইল দূরে ব্রজবাকসায় একটি ধর্মীয় জালসায়। মাওলানা আহমাদ আলী সারাদিন চোখ বুঁজে পড়ে আছেন। সবাই তাঁর আশু মৃত্যুর আশংকায় প্রহর গুনছে। কেউবা তেলাওয়াত করছে। এমন সময় রাত ৯-টার দিকে কনিষ্ঠ পুত্র এসে পৌঁছে গেলেন।

তিনি কাছে এসে সালাম দিয়ে বসতেই মাওলানা চোখ মেলে তাকালেন। যেন এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই তিনি সারাদিন চুপচাপ সময় কাটিয়েছেন। তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে ছোট ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা শেষে ছেলের ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি আমার রক্তের সন্তান! একরার করো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দ্বীনে মুহাম্মাদীর উপরে কায়েম থাকবে?' প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র তার প্রাণের চাইতে আপন স্বীয় শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধেয় পিতার পবিত্র হাতে হাত রেখে অশ্রুসজল নেত্রে উপস্থিত শতাধিক মানুষের সম্মুখে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে একরার করলেন।

ঐ একটি বাক্যের মাধ্যমেই তিনি যেন তাঁর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজ হাতে গড়া প্রিয় সন্তানের হাতে ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি এখন ভারমুক্ত। হাসিমুখে তিনি এখন প্রিয়বন্ধুর সান্নিধ্যে বিদায় নেবেন। দীর্ঘ ৯৪ বৎসরের দুনিয়াবী মায়াবন্ধন এখন ছিন্ন করার পালা। কিন্তু সবাই যে চায় তাঁর বিদায়কালীন অছিয়ত শুনতে। তিনি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে বললেন। কিন্তু বাষ্পরুদ্ধ শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক, আলেম-ওলামা, আত্মীয়-পরিজন কারুপক্ষে তখন সম্ভব ছিল না স্বাভাবিক কণ্ঠে তেলাওয়াত করা। তাই অর্ধশতাধিক বছরের শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক আলেমে দ্বীন মাওলানা আহমাদ আলী অবশেষে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন উপদেশমূলক আয়াত বাছাই করে নিজেই তেলাওয়াত শুরু করলেন ও সবাইকে তার সঙ্গে তেলাওয়াত করতে বললেন। সূরায়ে বাক্বারাহ্র

১৫৩ আয়াত *'অলা তাকূলু'...* হ'তে শুরু করে ১৫৬ আয়াতের শেষে *'ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন'* পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তাঁর যবান আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেল। অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হ'ল *'আর-রফীক্বাল আ'লা'* (সর্বোচ্চ বন্ধু)। এই কথাটি মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখ দিয়ে বের হয়েছিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল। ঠিক রাত ৯.২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন* ।

আজীবন শিক্ষক ও অভিভাবক মাওলানা আহমাদ আলী মৃত্যুর প্রাক্কালেও শিক্ষকের ভাবমূর্তি বজায় রেখে বিদায় নিলেন। *আল্লাহুম্মাগফিরলাহু অরহামহু অ'আ-ফিহি অ'ফু আনহু...* আমীন! তাঁর রোগ ভোগের মেয়াদ ছিল সর্বমোট ৪ মাস ২৩ দিন। রোগ কোন ডাক্তারেই নির্ণয় করতে পারেননি। তবে সূত্রপাত হয়েছিল বাসি দই খেয়ে পেট ফেঁপে যাওয়া থেকে।

পরদিন দুপুর সাড়ে বারোটায় জানাযা হয়। খুলনা-যশোর যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছের সভাপতি মাওলানা মতীউর রহমান, অন্যতম সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান আল-আযহারী, সাতক্ষীরা শহর জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা এরশাদসহ বহু আলেম-ওলামা ও ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও সর্বস্তরের কয়েকশত শোকাহত মানুষ জানাযায় শরীক হন। সকলের দাবীক্রমে কনিষ্ঠপুত্র মাওলানা আসাদুল্লাহ আল-গালিব বেদনাপ্লুত হৃদয়ে ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন। অতঃপর তিনি ও মাওলানা মরহূমের প্রিয় ছাত্র সাতক্ষীরার কামাল নগরের মাওলানা আব্দুছ ছামাদ মিলে মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম জানালা বরাবর অদূরবর্তী পারিবারিক গোরস্থানে চিরস্থায়ী আবাসগৃহের ছোট্ট পরিসরে অতি সযতনে চিরদিনের জন্য শুইয়ে দেন।... *আল্লাহুম্মাগফির লাহূ ওয়া আকরিম নুযুলাহু অ অসসে' মাদখালাহু* -আমীন!

❑ কে কি বলেন :

(১) ঢাকার জাতীয় দৈনিক 'আজাদে' মাওলানা আহমাদ আলীর মৃত্যু সংবাদ পাঠ করে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী মাওলানা মরহূমের কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট প্রেরিত শোকবাণীতে বলেন, 'মাওলানা আহমাদ আলী শুধু তোমাদেরকেই এতীম করেননি। তাঁর তিরোধানে এতীম হয়েছি আমরা সবাই। সারা জমঈয়ত আজ তোমার সাথে তোমার ব্যথায় সমব্যথী। তাঁর মহান জীবনের মহান কীর্তিসমূহ স্মরণ করে প্রত্যেকটি আহলেহাদীছ তথা প্রত্যেকটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাঁর মৃত্যুহীন জীবনের জয়গান গাইবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মহাপ্রাণ মর্দে মুমিনকে জান্নাতুল ফিরদৌসে উচ্চ আসন দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর পদাংক অনুসরণ করে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

(২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড: মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমান তাঁর প্রেরিত শোকবাণীতে বলেন, 'মাওলানা আহমাদ আলী ছিলেন একজন গভীর জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন আলেম। তাঁর ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত'।

(৩) একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান বলেন, 'এমন গভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলেম আমি কখনো দেখিনি। সাতক্ষীরায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'তে না পারলে জীবনে অনেক কিছুই শেখার বাকী থাকতো'।

(৪) খুলনার দৌলতপুর সরকারী বি.এল. কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান তাঁর শোকবাণীতে বলেন, 'তমসাবৃত অসংখ্য মুসলিমের অন্তরের প্রদীপ্ত দীপশিখা হঠাৎ নিভে গেল। নিভে গেল সেই আলো, যা যুগের পর যুগ ধরে অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে জোর করে ঘর থেকে বের করে এনে পথ দেখালো। যিনি এতদিন ধরে মুহাম্মাদী আক্বীদাকে দৃপ্তকণ্ঠে ঘরে বাইরে ছাপার অক্ষরে মানুষের হৃদয় দুয়ারে পৌঁছালেন, যিনি বয়সের আয়েশ উপেক্ষা করে সমাজের দ্বারে দ্বারে মানুষকে দ্বীনে মুহাম্মাদীর দাওয়াত পৌঁছালেন, সেই মর্দে মুজাহিদ আজ পরলোকে...। মরহূম মাওলানা আহমাদ আলী আর জন্মাবেন না। বাংলার ঘরে ঘরে তিনি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন।'

(৫) ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আরাফাত' পত্রিকায় মাওলানা আহমাদ আলীর মৃত্যুতে লিখিত দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে মরহূমের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি তাঁর মন্তব্যে বলেন, 'মাওলানা আহমাদ আলী মারা গিয়েছেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রদল ও তস্য ছাত্রমণ্ডলী, তাঁহার গঠনমূলক কর্মকাণ্ড এবং পুস্তকাদির মাধ্যমে তিনি দীর্ঘদিন সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিবেন'।

উক্ত পত্রিকার ১৮ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা হ'তে পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় মাওলানা মরহূমের সংক্ষিপ্ত জীবনীও বের হয়।

হে আল্লাহ! তুমি মাওলানাকে ক্ষমা কর এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চাসন দান কর! -আমীন!!

॥ সমাপ্ত ॥

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ –

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ–